মি লা ন কু ন্ডে রা

স্লোনেস

অনুবাদ ও টীকা

আনিসুল হক

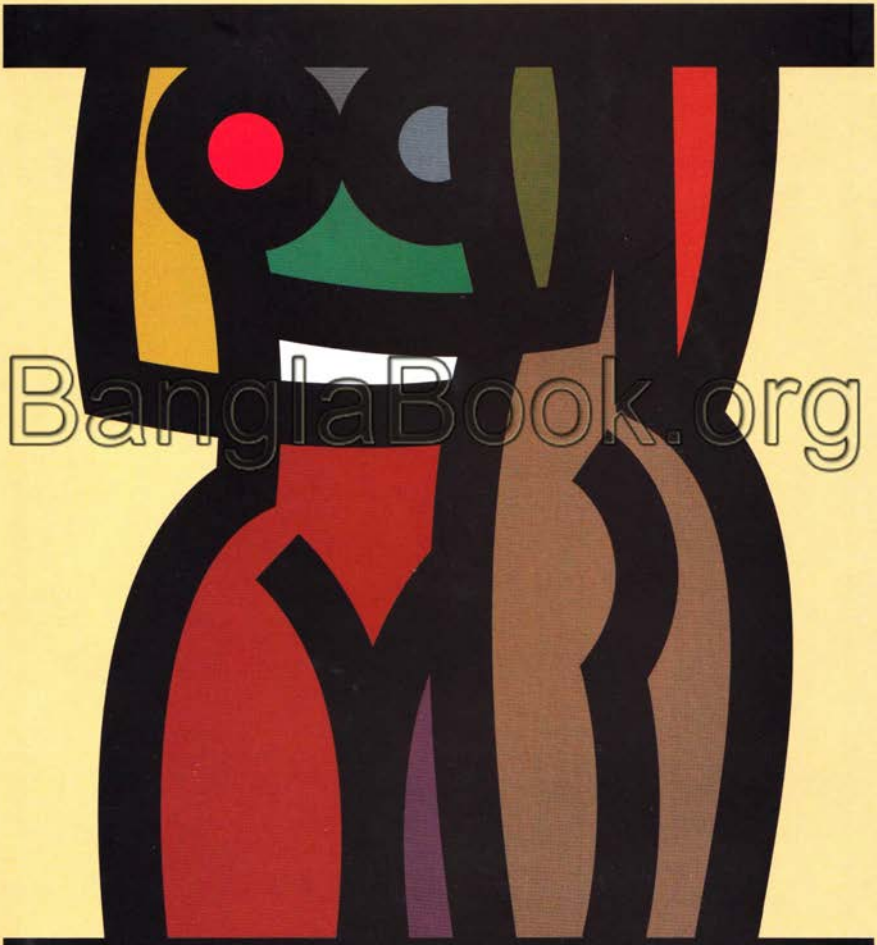

BanglaBook.org

এই উপন্যাসের একটা প্রধান উপকরণ যৌনতা। মিলান কুন্ডেরা সম্ভবত উপন্যাসের বিষয় হিসেবে যৌনতা নিয়ে কাজ করা যায় কি না, করলে কীভাবে করা যায়, তাতীতে

মিলান কুন্ডেরার *স্নোনেস* এমন একটি উপন্যাস, যেটি লেখক মাতৃভাষা চেক ভাষায় লেখেননি, লিখেছেন ফরাসি ভাষায়। ১৯৯৫ সালে *স্নোনেস* প্রকাশিত হয়। মাতৃভাষার বাইরে অন্য একটি ভাষায় লেখা কুন্ডেরার প্রথম উপন্যাস হিসেবেও *স্নোনেস* গুরুত্বপূর্ণ। কুন্ডেরার বিখ্যাত উপন্যাস *ঠাট্টায়* তিনি গল্প বলেছেন প্রচলিত কায়দায়। এরপর তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসেই একটা ছক চোখে পড়ে। তিনি গল্প বলেন সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা করতে করতে। কখনো গল্পের একেবারে বাইরে গিয়ে তত্ত্ব আলোচনা করেন। কথা বলতে শুরু করেন বিভিন্ন লেখক বা শিল্পীর কাজ নিয়ে। *স্নোনেস* সে ধরনের একটি উপন্যাস।

উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক। অনেক চরিত্রের মধ্যে আছেন কুন্ডেরা নিজে এবং তাঁর স্ত্রী। উপন্যাসের কাহিনির বিন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণা এ উপন্যাস ভেঙে দেয়। লেখক একটা গল্প থেকে আর একটা গল্পে ঢুকে পড়েন। রাজনীতির মাঠ থেকে হাজির হন নাটকের মঞ্চে। একটা আধুনিক মোটর গাড়ির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন সামন্ত সমাজের ঘোড়ার গাড়ির।

শেষে আমরা দেখব কী চমৎকারভাবেই না কুন্ডেরা তাঁর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছান।

আনিসুল হক জানেন উপন্যাস অনেক রকম। সে কারণেই *স্নোনেস* বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন উপন্যাস রচনার কারিগরি দিক ও তার নির্মাণরহস্য।

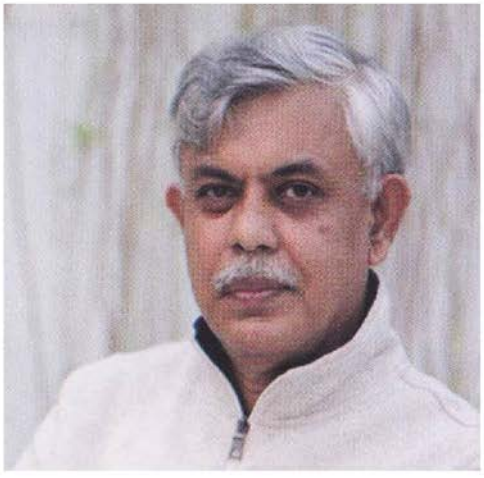

আনিসুল হক

কথাশিল্পী, কবি, সাংবাদিক। জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, নীলফামারী। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে রংপুরে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেসময়ের মানুষদের নিয়ে তাঁর লেখা উপন্যাসের পাঁচটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে : *যারা ভোর এনেছিল*, *উষার দুয়ারে*, *আলো-আঁধারের যাত্রী*, *এই পথে আলো জ্বেলে* ও *এখানে থেমো না*। তাঁর *মা* উপন্যাসের শততম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। আনিসুল হকের কবিতার বইয়ের সংখ্যা ১১। তাঁর কবিতার বই *আবার বসব মুখোমুখি* সম্প্রতি প্রকাশ করেছে বাতিঘর।

তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর বই দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মিলান কুন্ডেরা : মিলান কুন্ডেরা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় লেখক, একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৯২৯ সালের ১ এপ্রিল, কাফকার দেশ চেকোস্লোভাকিয়ায়। রাজনৈতিকভাবে মানবতাবাদী উদারনৈতিক। সরকারের সাথে মতানৈক্যের কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পান ১৯৮১ সালে। প্রধানত চেক ভাষায় লেখেন। তবে কিছু বই লিখেছেন ফরাসি ভাষায়। ফরাসি ভাষায় প্রথম উপন্যাস *স্লোনেস*। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* বইটিও ফরাসি ভাষায় লেখা। *ঠাট্টা* কুন্ডেরার প্রথম এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কুন্ডেরার রচনা প্রায় চল্লিশের অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই সাহিত্যে নোবেল প্রাইজের শর্টলিস্টে তার নাম থাকে।

www.BanglaBook.org

মিলান কুন্ডেরা

স্লোনেস

মিলান কুন্ডেরা

স্লোনেস

অনুবাদ এবং টীকা

আনিসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্লোনেস

মিলান কুন্ডেরা

অনুবাদ এবং টীকা : আনিসুল হক

বাংলা অনুবাদস্বত্ব © ২০২১, অনুবাদক

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৭, ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক : বাতিঘর

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র

বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা

বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম

বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট

বাতিঘর বাংলাবাজার : রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বাতিঘরের বই ও দেশি-বিদেশি যেকোনো বই অর্ডার করুন

www.baatighar.com

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : বাতিঘর প্রকাশনা বিভাগ

মূল্য : ২৬০ টাকা

Slowness

A novel by Milan Kundera

Translated in Bengali by Anisul Haque

Bishwo Shahitto Kendro Bhavan

17 Mymensingh Road, Bangla Motor, Dhaka, Bangladesh

Email baatighar.pub@gmail.com

Price BDT 260.00 USD 13.00

ISBN 978-984-95336-3-4

ফকরুল আলম স্যার
অনুবাদ সাহিত্যে যাঁর অবদান অতুলনীয়

প্রবেশক

যৌনতা *স্লোনেস*-এর একটা প্রধান উপাদান, হয়তো প্রধান উপজীব্যও। এ উপন্যাসে এত বেশি যৌনতা এবং তা এত গাঢ় উজ্জ্বল রঙে আঁকা যে এটা ধারাবাহিকভাবে অন্য আলো ডট কমে প্রকাশ করতে গিয়ে একপর্যায়ে থামিয়ে দিতে বাধ্য হই। অনলাইন সবার জন্য। বই সবার জন্য নয়। বই তাঁর জন্য, যিনি এটা কেনেন বা সংগ্রহ করেন এবং পাতা উল্টিয়ে পড়তে থাকেন। বইটা বন্ধ করার সুযোগ তাঁর জন্য সব সময়েই খোলা থাকে। আমি প্রথমেই বলে রাখছি, এই বইয়ের একটা প্রধান উপকরণ যৌনতা। মিলান কুন্ডেরা সম্ভবত উপন্যাসের বিষয় হিসেবে যৌনতা নিয়ে কাজ করা যায় কি না, করলে কীভাবে করা যায়, অতীতে এই বিষয় নিয়ে কোন কোন লেখক কী কী কাজ করলেন, সেসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে বইটি লিখেছেন এবং লিখতে লিখতে ভেবেছেন।

১৯৯৫ সালে *স্লোনেস* প্রকাশিত হয়। ফরাসি ভাষায়। তার আগে কুন্ডেরা চেক ভাষাতেই লিখতেন। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি ফ্রান্সে বাস করতে থাকেন এবং ১৯৮১ সালে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পান। মাতৃভাষার বাইরে অন্য একটি ভাষায় লেখা কুন্ডেরার প্রথম উপন্যাস হিসেবেও *স্লোনেস* গুরুত্বপূর্ণ।

মিলান কুন্ডেরা আমাদের কালের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৯২৯ সালের ১ এপ্রিল, কাফকার দেশ চেকোস্লোভাকিয়ায়। তাঁর লেখায় কাফকার প্রভাব স্পষ্ট, এবং তাঁর সাহিত্য-আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে কাফকা প্রসঙ্গ।

কুন্ডেরার প্রথম উপন্যাস *ঠাট্টা*। এ উপন্যাসে তিনি প্রচলিত কায়দায় গল্প বলে গেছেন। সম্ভবত *ঠাট্টা*ই তাঁর সেরা উপন্যাস। এরপর তাঁর বেশির

BanglaBook.org

ভাগ উপন্যাসেই একটা ছক লক্ষ করি, তিনি গল্প বলেন সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা করতে করতে। গল্প বলা থামিয়ে তত্ত্ব আলোচনা করেন। বিভিন্ন লেখকের বা শিল্পীর কাজ নিয়ে কথা বলেন।

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কবিতা অনেক রকম।' আমরা বলব, উপন্যাসও অনেক রকম হতে পারে। পাবলো নেরুদা বলেছিলেন, 'সবকিছুই চলে কবিতায়, তোমার যা খুশি। শুধু দেখতে হবে তা যেন সাদা কাগজের চেয়ে উত্তম হয়।' আমরা বলব, সবকিছুই ঢুকিয়ে দেওয়া যায় উপন্যাসে, শুধু দেখতে হবে, তা যেন সাদা কাগজের চেয়ে ভালো হয়।

জানি উপন্যাস অনেক রকম। জানাটা আরও পোক্ত করার জন্য, নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য (এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য) আমি মিলান কুন্ডেরার *স্লোনেস* উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

উপন্যাসের অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কথা বলব। বোঝার চেষ্টা করব, উপন্যাসটা কোন দিকে গেল! কোন কায়দায় কুন্ডেরা কোন চ্যাপ্টারটা লিখলেন! উপন্যাস রচনার কারিগরি দিক, এর নির্মাণরহস্য বোঝার চেষ্টা করব।

উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক। এতে কুন্ডেরা নিজে একটা চরিত্র। আরেকটা চরিত্র তাঁর স্ত্রী ভেরা। এতটুকুন বলে আমরা গল্পে চলে যাব। এরপর আপনাদের উপন্যাস পাঠের গতি যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য অনুবাদকের টীকা-টিপ্পনীগুলো দেব ফুটনোট হিসেবে। আর মূল কাহিনি থেকে আলাদা করার জন্য সেসব দেওয়া হবে ছোট অক্ষরে।

আনিসুল হক
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১

আমাদের হঠাৎই খেয়াল চাপল, আমরা একটা সন্ধ্যা, একটা রাত কাটাব একটা বাগানবাড়িতে। এ ধরনের শাটো বা বড় বাগানবাড়ির অনেকগুলোকেই ফ্রান্সে এখন হোটেল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। কদর্যতার কাছে চাপা পড়ে যাচ্ছে একেকটা সবুজ চত্বর; পায়ে চলা পথ, গাছগাছালি, পাখপাখালি আটকা পড়ছে মহাসড়কের বিশাল জালের মধ্যে। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। পেছনে দেখার আয়নায় লক্ষ করি আমার পিছু পিছু ধেয়ে আসছে একটা গাড়ি। একটা লাল আলো বাম পাশে জ্বলছে, নিভছে। পুরো গাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি অধৈর্য। ওই গাড়ির চালক আমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে। একটা চিল যেমন একটা চড়ুইকে ধরার মুহূর্তটির জন্য ওত পেতে থাকে।

আমার স্ত্রী ভেরা আমাকে বলে, 'প্রতি ১৫ মিনিটে ফ্রান্সে কেউ না কেউ রাস্তায় মারা যায়। এদের দিকে তাকাও। সব উন্মত্ত মানুষ তেড়েফুঁড়ে আসছে আমাদের দিকেই। এই লোকগুলোই আবার যখন কোনো বৃদ্ধাকে ছিনতাইকারীর হাতে পড়তে দেখে, নিজের জান বাঁচানোর জন্য তটস্থ-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে তারা যখন গাড়ি চালায়, তখন কেন একটুও ভয় পায় না?'

আমি কীই-বা বলতে পারি? হয়তো বলতে পারি একজন লোক যখন মোটরসাইকেলে বাঁকা হয়ে বসে, সে কেবল সেই মুহূর্তটাতেই মনোনিবেশ করতে পারে। সময়ের একটা কাটা অংশে আটকা পড়ে সে, যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। সময়ের ধারাবাহিকতা থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। সে সময়ের বাইরে। একটা ঘোরলাগা তীব্র আমোদের ভেতরে আছে সে। এ অবস্থায় সে ভুলে গেছে তার বয়স, তার স্ত্রী, তার সন্তান,

তার উদ্বেগ; সুতরাং তার আর কোনো ভয় নেই। কারণ, তার ভয়ের উৎসটা পড়ে আছে ভবিষ্যতে। একজন মানুষ, যে ভবিষ্যৎ থেকে মুক্ত, সে ভয় থেকেও মুক্ত।

প্রযুক্তির বিপ্লব মানুষকে দিয়েছে গতি, গতি হলো এক উত্তুঙ্গ আমোদের নাম। মোটরসাইকেল চালকের বিপরীত অবস্থা একজন দৌড়বিদের। সে সব সময় তার দেহের মধ্যেই উপস্থিত আছে। তাকে সব সময় তার শরীরের ফোসকা নিয়ে ভাবতে হয়, ভাবতে হয় পরিশ্রান্তি নিয়ে; সে তার ওজন অনুভব করে, নিজের এবং নিজের জীবনের সময় নিয়ে সে অনেক বেশি সচেতন থাকে। এর সবই বদলে যায়, যখন একজন মানুষ তার গতির দায়িত্বটা একটা যন্ত্রের ওপরে ছেড়ে দেয়, তখন তার শরীর আর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়, সে গতির কাছে হাল ছেড়ে দেয়, যে গতির সঙ্গে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, বস্তুর কোনো সম্পর্ক নেই—বিশুদ্ধ গতি, স্বয়ং গতি, চরমানন্দ গতি।

কৌতূহলোদ্দীপক মিল প্রযুক্তির শীতল উদাসীনতা বনাম আমোদের অগ্নিশিখা। আমার মনে পড়ছে ত্রিশ বছর আগের কথা। একজন আমেরিকান নারী আমাকে লেকচার দিয়েছিলেন। ইরোটিসিজম পার্টির একজন সদস্যের মতো করে তিনি লেকচার দিচ্ছিলেন। অবশ্য তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল সেটা। ভীষণ শক্ত আর অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল ভঙ্গি। তিনি বলছিলেন যৌনতার মুক্তি নিয়ে। তার বক্তৃতায় একটা শব্দ বারবার আসছিল, তা হলো 'অর্গাজম'। আমি গুনেছি, ৪৩ বার অর্গাজম বলেছিলেন তিনি। দ্য রিলিজিয়ন অব অর্গাজম, যৌনজীবনে উপযোগিতাবাদ, দক্ষতা বনাম নিষ্ক্রিয়তা, সঙ্গম হলো একটা বাধা, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তা পার হয়ে গিয়ে চরম পুলক পেতে হবে, তা-ই হলো মিলনের এবং দুনিয়ার একমাত্র সত্য লক্ষ্য।

কেন ধীরতার সুখ বিশ্ব থেকে উধাও হয়ে গেল? বিগত বছরগুলোর সেই মন্থর হাঁটা? কোথায় গেল লোকগানের সেই ভবঘুরে নায়কেরা, যারা একটা কল থেকে আরেকটা কলে যাযাবরের মতো ঘোরাঘুরি করত আর নক্ষত্ররাজির নিচে ঘুমাত। ঘাসের সঙ্গে, পায়ে চলা পথের সঙ্গে, খোলা পরিসর আর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তারাও গেছে হারিয়ে। একটা চেক প্রবাদ আছে, তাদের কুঁড়েমি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে প্রবাদটির এক উপমার মধ্য

BanglaBook.org

দিয়ে : 'তারা খোদার জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।' যে লোক খোদার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে কখনো একঘেয়েমিতে ভুগবে না। আর আমাদের দুনিয়ায় কুঁড়েমি মানে সম্পূর্ণ আলাদা, কোনো কিছু করার নেই। যার কিছু করার নেই, সে হতাশ, বিরক্ত, কিছু একটা করণীয় খুঁজতে সদা ব্যস্ত। আর খোদার জানালার দিকে যে তাকিয়ে আছে, সে সুখী।

আমি আবার গাড়ির আয়নায় তাকাই। বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসছে, তাই সেই আগের গাড়িটা আমাকে অতিক্রম করতে না পেরে পিছু লেগে আছে। সেই চালকের পাশে একজন নারীও আছে। কেন ব্যাটা নারীকে মজার কোনো কথা বলছে না? কেন সে তার হাঁটুতে হাত রাখছে না? তার বদলে সে তার সামনের চালককে অভিশাপ দিচ্ছে যথেষ্ট জোরে গাড়ি না চালানোর জন্য। আর নারীটাই-বা কেমন? সে-ও তো লোকটার গায়ে হাত রাখতে পারত। তা না করে সে-ও গাড়ি চালানোর পাল্লায় যোগ দিয়েছে। আর আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

আর আমি প্যারিস থেকে পল্লি বাগানবাড়ির দিকে যাত্রার আরেকটা কাহিনি মনে করতে পারি। সেটা ছিল দুই শ বছর আগের একটা ঘটনা। মাদাম দে টি এবং তরুণ শেভালিয়ে গিয়েছিলেন সে যাত্রায়। সেই প্রথম তারা দুজন দুজনের এত কাছে। তারা ছিলেন একটা ঘোড়ার গাড়িতে, গাড়ি দুলছিল, দুটো শরীর কাছাকাছি পাশাপাশি, গায়ে গায়ে লাগছিল, প্রথমে অনিচ্ছায়, তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে; ছন্দময় ধীরতা থেকে যৌনতার আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিল। সেখানেই শুরু হলো গল্পটা।

BanglaBook.org

২

ভিভাঁ দেনোঁ তাঁর উপন্যাসিকায় এই কথাই বলতে চেয়েছেন বিশ বছর বয়সী এক ভদ্রলোক এক সন্ধ্যায় গিয়েছেন থিয়েটারে। (তার নাম, পদবি কিছুই বলা হয়নি, কিন্তু আমি কল্পনা করি তিনি একজন শেভালিয়ে বা নাইট।) থিয়েটার হলে পরের বক্সে বসে আছেন একজন ভদ্রমহিলা, দেখতে

পেলেন শেভালিয়ে। (উপন্যাসিকায় ভদ্রমহিলার নাম দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে নামের আদ্যক্ষর। মাদাম দে টি। এই ভদ্রমহিলার একজন বান্ধবী আছেন, তিনি আবার এই শেভালিয়ের প্রেমিকা। ভদ্রমহিলা শেভালিয়েকে অনুরোধ জানালেন, নাটক দেখা শেষ করে তিনি যেন তার সঙ্গে তার বাড়ি যান। ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। কারণ, তিনি জানেন মাদামের একজন খাতিরের লোক আছে। মার্কিস ধরনের নাম। (এই বইয়ে মার্কিসের নামও বলা হবে না। আমরা একটা গোপনীয়তার দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছি। যেখানে কারও কোনো নামই নেই।) রহস্যদীর্ণ শেভালিয়ে এরপর নিজেকে আবিষ্কার করেন এই মধুময় ভদ্রমহিলার সঙ্গে একই ঘোড়ার গাড়িতে। মধুর মসৃণ এক যাত্রা শেষে তাদের গাড়ি এসে থামে চমৎকার পল্লিপ্রান্তরে এক বাগানবাড়ির প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির সামনে। সেখানে মাদাম দে টির স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের অভ্যর্থনা জানাতে। তিনজন একসঙ্গে নৈশভোজ সারেন অস্বস্তিকর অনুষ্ণ পরিবেশে, তারপর স্বামীটি তাদের দুজনকে একত্রে ছেড়ে দিয়ে নিজে বিদায় নেন।

শুরু হয় তাদের রাত।

আপনাদের অনুবাদক আনিসুল হক বলছি : *স্লোনেস* উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুর খানিকটা আমরা পড়ে ফেললাম। *স্লোনেস*-এর বাংলা কী করতে পারি? ধীরতা, মন্থরতা, কুঁড়েমি, মন্দগতি। কিন্তু আমার প্রস্তাব হলো 'ধীরে চলা'। বুঝতেই পারছেন, মুখের ভাষার কাছাকাছি থাকতে চাই।

উপন্যাসের শুরুতে গল্পের কথক একটা গাড়িতে চলেছেন। পাশে তাঁর স্ত্রী ভেরা। প্যারিস থেকে গ্রামের পথে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি না কথকের নাম কী। তিনি দেখতে কেমন। গাড়িটা কী গাড়ি। ভদ্রলোক কী পরেছেন। তাঁর স্ত্রীর পরনেই-বা কী। পেট্রলের গন্ধ কি নাকে এসে লাগছে? শুধু পেছনে একটা গাড়ি ওভারটেক করার জন্য ছটফট করছে। সেই ছটফটানি সহ্য নয় কথকের; মানে মিলান কুন্ডেরার। তাই শুরু হলো গতি, স্থিরতা, ধীরতা নিয়ে তাঁর তত্ত্ব কপচানো। ভিভাঁ দেনোঁ তাঁর উপন্যাসে কী লিখেছেন, সেই উপন্যাসের কাহিনি নিজের উপন্যাসে বলছেন তিনি। আপাতত এতটুকুনই আমরা খেয়াল করব। খেয়াল করব, দ্বিতীয় চ্যাপ্টার শুরুর আগেই গল্পের মূল নায়ক-নায়িকা হারিয়ে গেছেন। চলছে অন্য গল্প।

সেই রাতটা শুরু হলো : তিন ক্যানভাসে আঁকা একটা ছবির মতো রাত, তিন পর্বে সাজানো একটা ভ্রমণের মতো রাত—তারা পার্কে হাঁটে, তারপর তারা একটা ছাউনিঘরে সঙ্গম করে, শেষে প্রাসাদের এক গোপন ঘরে সঙ্গম চালিয়েই যায়।

দিনের প্রথম আলো ফোটার সময় তারা আলাদা হয়। করিডরের গোলকধাঁধায় শেভালিয়ে হারিয়ে যায়। নিজের ঘর খুঁজে না পেয়ে সে চলে আসে পার্কে। সেখানে, কী আশ্চর্য, তার সাক্ষাৎ ঘটে মার্কিসের সঙ্গে। এই মার্কিসকেই তো মাদাম দে টির প্রেমিক বলে সে জানে। মার্কিস কেবল এলেন এই প্রাসাদে। তিনি শেভালিয়েকে অভিবাদন জানালেন হাসিমুখে। মার্কিস বললেন কেন মাদাম এই রহস্যময় অভিসারে শেভালিয়েকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাদামের একটা আড়াল দরকার ছিল, যাতে তার স্বামী মার্কিসকে সন্দেহ না করে। এই ফন্দি কাজে লেগেছে, তাই মার্কিস খুব খুশি। তিনি শেভালিয়েকে নকল প্রেমিকের মিশনটা পালন করার জন্য খানিকটা খোঁচা মারেন। আগের রাতের প্রেমলীলায় ক্লান্ত যুবক কৃতজ্ঞ মার্কিসের দেওয়া গাড়িতে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেয়।

এই উপন্যাসিকার নাম ছিল 'কোনো আগামীকাল নেই', 'নো টুমরো'। ১৭৭৭ সালে উপন্যাসিকাটি প্রথম বেরোয়। লেখকের নামটা আড়াল করা হয়েছিল ছয়টা রহস্যময় অক্ষর দিয়ে—ম. দে. রা. জ. অ. ভ.। যার মানে করা যায়, মসিয়ে দেনো, রাজার জন্য অপেক্ষমাণ ভদ্রলোক। ১৭৭৯ সালে বইটি আবার বের হয়, এবারও লেখকের নাম ছাড়া এবং ছাপা হয় খুবই অল্পসংখ্যক কপি। পরের বছর বইটা বের করা হয় আরেকজন লেখকের নামে। আরও সংস্করণ বের হয় ১৮০২ সালে। ১৮১২ সালে লেখকের আসল নাম ছাড়া এটাকে আবার প্রকাশ করা হয়। অর্ধশতকের উপেক্ষা শেষে বইটি ফের বের হয় ১৮৬৬ সালে। এরপর বইটার লেখক হিসেবে ভিভাঁ দেনোঁ স্বীকৃতি পান।

ওই শতকের বাকি সময়টা এই বইয়ের সুনাম বাড়তেই থাকে। আজকের দিনে বইটি আঠারো শতকের শিল্প ও চেতনার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

BanglaBook.org

৩

হেডোনিজম বা ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণতা প্রত্যেক ভাষাতেই অনৈতিক যৌনতাময় জীবনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। ব্যাপারটাকে যদিও সরাসরি পাপ বলে নির্দেশ করা হয় না। এটা অবশ্যই ভুল। এপিকিউরাস ছিলেন আনন্দ বিষয়ে প্রথম মহান তাত্ত্বিক। সুখী জীবন সম্পর্কে তিনি খুব পলায়নবাদী একটা ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, আনন্দ হচ্ছে কষ্টের অবসান। তা হলে দাঁড়ায়, কষ্ট হচ্ছে হেডোনিজমের মৌলিক একটা চিহ্ন। একজন ততটুকুই সুখী, যতটুকু সে কষ্ট এড়াতে পারে। যেহেতু আনন্দ প্রায়ই সুখহীনতা ডেকে আনে, সুখের চেয়েও বেশি করে আনে অ-সুখ, সুতরাং এপিকিউরাস সেই সুখকেই অনুমোদন করেন, যা ভবিষ্যতের কথা ভাবে, যা পরিমিত। এপিকিউরীয় জ্ঞানের পেছনে আছে বিষাদের একটা পর্দা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ একটাই পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য মূল্যবোধ দেখতে পায়, তা হলো সুখ, অতি তুচ্ছ পরিমাণে সুখ, যা সে তার নিজের জন্য অনুভব করতে পারে : একটুখানি শীতল জল পান, একটুখানি আকাশের দিকে তাকানো (খোদার জানালার দিকে), একটুখানি আদর।

যে ব্যক্তি পায়, আনন্দ শুধু তার, পরিমিত কিংবা অপরিমিত, সুতরাং একজন দার্শনিক ন্যায্যভাবেই হেডোনিজমের সমালোচনা করতে পারেন, কারণ তা কেবল নিজেতেই নিহিত। তা সত্ত্বেও আমি দেখি এভাবে, হেডোনিজমের দুর্বল জায়গা, একিলিসের গোড়ালিটা, এটা নয় যে তা আত্মকেন্দ্রিক, বরং তা ইউটোপিয়ান (আহা, আমার ধারণা যদি ভুল হতো!)। আমার সন্দেহ হয় যে, আসলেই আদর্শ হেডোনিজম কোনো দিন অর্জন করা সম্ভব নয়। আমার আশঙ্কা, সেটা যে ধরনের জীবনের সুপারিশ করে, তা কোনো দিনও মানব-স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না!

আঠারো শতকের আর্ট নৈতিকতার নিষেধাজ্ঞা কুয়াশা থেকে আনন্দকে আলাদা করেছিল। এটা মনের সেই কাঠামোটাকে আনতে পেরেছিল, যাকে আমরা বলি লিবারটাইন, অবদমনমুক্ত মানুষ। ফ্রাগোনার্দ এবং ওয়াতোর চিত্রকলা, দে সাদে, জুনিয়র ক্রেবিয়ঁ বা শার্ল দুকলোর পৃষ্ঠা থেকে যার

BanglaBook.org

রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই আমার তরুণতর বন্ধু ভিনসেন্ট আঠারো শতকের প্রশংসা করে। যদি পারত, সে তার বুকে মার্কিস দে সাদের নামফলক বহন করত। আমি তার এই মুগ্ধতা শেয়ার করি। কিন্তু তার সঙ্গে আমি এটাও যোগ করতে চাই, আর্টের সত্যিকারের মহত্ত্ব হেডোনিজমের প্রোপাগান্ডা বা অন্য কিছুর ওপরে নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে এটার ব্যাখ্যার ওপরে (কিন্তু আমার এই কথা কেউ শোনে না)। এ কারণেই আমি Pierre Choderlos de Laclos-এর লেখা *লে লিয়াজোঁ দঁজারেজোঁকে* (ডেঞ্জারাস লিয়াজোঁ) সর্বকালের সেরা একটি উপন্যাস বলে গণ্য করি।

এর চরিত্রগুলো কেবল প্রমোদকে জয় করা নিয়ে চিন্তিত নয়; একটু একটু করে পাঠকেরা বুঝতে পারেন, তারা আসলে আকৃষ্ট হচ্ছেন প্রমোদ দিয়ে নয়, জয়ের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। প্রমোদের জন্য কামনা নয় বরং বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাই এই বইয়ের মূল সুর। এটা প্রথম দেখা যায় তখন, যখন একটা প্রমোদপূর্ণ খেলা চুপিসারে আর অনিবার্যভাবে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে পরিণত হয়। কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে হেডোনিজমের সম্পর্ক কী? এপিকিউরাস লিখেছেন, 'কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কাজের সন্ধান করেন না।'

ডেঞ্জারাস লিয়াজোঁ বইটি চিঠির আকারে লেখা, কিন্তু এর গঠনশৈলী কেবল একটা কারিগরি প্রক্রিয়ামাত্র নয় যে তা আরেকটা আঙ্গিক দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাবে। এই ফর্ম নিজে খুবই সাবলীল। এটা আমাদের বলে যে চরিত্রগুলোর ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে, তা ঘটেছে তারা এ সম্পর্কে মুখ খুলেছিল বলে; তারা জানিয়েছিল, রটিয়েছিল, স্বীকার করেছিল, লিখেছিল। এ ধরনের একটা পৃথিবীতে, যেখানে সবকিছু বলে ফেলা হয়, সেখানে একটামাত্র অস্ত্র আছে, সদা প্রস্তুত, সবচেয়ে প্রাণঘাতী, তা হলো প্রকাশ করে দেওয়া। উপন্যাসের নায়ক ভালমতঁ এক মেয়েকে পটিয়েছিল। সে একটা শেষ চিঠি লেখে মেয়েটিকে। মেয়েটির জীবন ধ্বংস করে দেয় চিঠিটি। লোকটা আবার চিঠিটা লিখেছিল তার মেয়েবন্ধুর ডিকটেশন থেকে। এই মেয়েবন্ধুর নাম মার্কিস দে মের্তেই। তার কথামতো ভালমতঁ চিঠির প্রতিটা শব্দ শ্রুতলিখন করে। পরে এই মেয়েবন্ধু ভালমতেঁর একটা চিঠি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে প্রকাশ করে দেয়। এই লোক তখন ভালমতঁকে

BanglaBook.org

মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে। তাতে ভালমতঁ মারা যায়। এরপর ভালমতঁ আর মেরতির গোপন অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রও প্রকাশ হয়ে পড়ে। যা মার্কিস দে মেরতির দিনরাতকে ছারখার, ধ্বস্ত, বিষাক্ত করে দেয়।

এই উপন্যাসে কোনো জুটির কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকে না। একটা শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, এই উপন্যাসে তেমনি করে প্রতিটা মানুষ একটা করে শঙ্খের মধ্যে বাস করে, যেখানে প্রতিটা ফিসফিস করে বলা কথাও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বহুগুনিত শেষহীন সেই প্রতিধ্বনি। যখন ছোট ছিলাম, লোকে আমাকে বলত শঙ্খ কানে দাও, সমুদ্রের শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পাবে। তেমনিভাবে এই চিঠির আকারে লেখা উপন্যাসে প্রতিটা শব্দ চিরকালের জন্য বারবার করে শোনা যায়। এই কি তাহলে অষ্টাদশ শতকের রূপ? এই কি তাহলে সেই বিখ্যাত সুখের স্বর্গ? নাকি মানুষ চিরটাকাল বসবাস করে এসেছে প্রতিধ্বনিময় শঙ্খের ভেতরে, কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। যা-ই হোক না কেন, প্রতিধ্বনিময় শঙ্খ এপিকিউরাসের জগৎ নয়—এপিকিউরাস তার শিষ্যদের আদেশ করেছিলেন, 'তোমরা অবশ্যই গোপনভাবে বসবাস করবে।'

স্লোনেস-এর তিনটা অধ্যায় আমরা সম্পন্ন করেছি। আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা কেবল পড়ব না, এই উপন্যাসের গঠনশৈলীর দিকেও লক্ষ রাখব। বইটা শুরু হয়েছিল একজন লোকের প্যারিস থেকে গ্রামের দিকে কোনো বাগানবাড়ি কাম হোটেলে থাকার উদ্দেশে সস্ত্রীক মোটরযাত্রা দিয়ে। লোকটার নাম আমরা জানি না, তার বউয়ের নাম ভেরা। আমরা গুগল করে জানতে পারি যে মিলান কুন্ডেরার বউয়ের নাম ভেরা। কাজেই ধরে নিতে পারি, মিলান কুন্ডেরাই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা লেখকের আত্মজৈবনিক উপন্যাস—একধরনের স্বীকারোক্তি বা নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

কিন্তু আমরা সেই নায়ককে, অর্থাৎ গল্পের কথক মিলান কুন্ডেরাকে ভুলে গেছি। আমরা এরই মধ্যে দর্শন নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি। আঠারো শতকের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা হয়েছে গোপনীয়তা না থাকার যন্ত্রণা নিয়ে। সুখবাদ বা ভোগবাদ, শিশ্নোদরপ্রবণতা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। এবার আমরা ৪ নম্বর অধ্যায়ে ঢুকব এবং আমাদের প্রথম নায়ক (মিলান কুন্ডেরা) ও তার স্ত্রী ভেরাকে পাব। তাঁরা হোটেলে ঢুকছেন।

৪

হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের লোকটা বেশ ভালো। সাধারণত হোটেলের রিসেপশনে যে ধরনের লোক থাকে তাদের চেয়ে অনেক ভালো। রিসেপশনিস্ট আমাদের মনে করিয়ে দেন যে দুই বছর আগেও আমরা এই হোটেলে এসেছিলাম। দুই বছরে বহু কিছু বদলে গেছে। নানা ধরনের সভা করার জন্য তারা একটা কনফারেন্স রুম বানিয়েছে, একটা চমৎকার সুইমিংপুল বানানো হয়েছে। আমাদের কৌতূহল হয়, পুলটা দেখা দরকার। আমরা উজ্জ্বল একটা লবি পার হই, লবির জানালাগুলো পার্কের দিকে খোলা। লবির শেষ প্রান্তে একটা চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, সেখানেই টাইলে শোভিত একটা বড় সুইমিংপুল, তার ছাদটা কাচের। ভেরা মনে করিয়ে দেয়, শেষবার যখন এসেছিলাম, এখানে একটা গোলাপবাগান ছিল।

আমরা আমাদের রুমে থিতু হই। তারপর পার্কে যাই। সবুজ আঙিনা নেমে গেছে সেন নদীর দিকে। খুব সুন্দর! আমরা উচ্ছ্বসিত। আমরা অনেকটা পথ হাঁটব বলে সিদ্ধান্ত নিই। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই একটা হাইওয়ে এসে পড়ে, সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, আমরা ফিরে আসি।

রাতের খাবার ছিল দারুণ। প্রত্যেকে সুসজ্জিত, যেন এই ছাদের নিচে হারিয়ে যাওয়া পুরোনো দিনের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। আমাদের পাশে একটা জুটি, দুজন সন্তানসহ বসেছেন। বাচ্চাদের একজন জোরে গান গাইছে। একজন ওয়েটার ট্রে হাতে তাদের টেবিলে নত হয়ে আছেন। মা তাকিয়ে আছেন তার ছেলের দিকে, তিনি চাইছেন ওয়েটার তার ছেলের প্রশংসা করুক, সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ছেলেটি আরও উৎসাহিত হয়ে গাইছে। এবার সে উঠে দাঁড়াল চেয়ারের ওপরে, আর গানের গলা চড়িয়ে দিল। বাবাটার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

চমৎকার ওয়াইন বর্দা, হাঁস, মিষ্টান্ন (এই হোটেলের গোপন

BanglaBook.org

রেসিপি—গল্প করি ভেরা আর আমি। তৃপ্ত, ভাবনাহীন। রুমে ফিরে আসি। টেলিভিশন অন করি। টেলিভিশনের পর্দায় আরও শিশু। এবার কালো শিশু। তারা মারা যাচ্ছে। আমরা যখন এই হোটেলে আসি, তখন সপ্তাহের প্রতিটা দিন একটা আফ্রিকান দেশের শিশু দেখানো হয়, যে দেশটা গৃহযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষে পীড়িত। যে দেশের নাম এর মধ্যে সবাই ভুলে গেছে। (এসবই ঘটেছিল দুই বা তিন বছর আগে, কেমন করে এসব নাম মনে রাখা একজনের পক্ষে সম্ভব।) শিশুগুলো হাড্ডিসার, ক্লান্ত, মুখের ওপর থেকে হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর শক্তিও তাদের নেই।

ভেরা আমাকে বলে, 'ওই দেশে কি কোনো বুড়ো মানুষ মারা যায় না?'

না, না। দুর্ভিক্ষের কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষের একটা অভিন্ন সাদৃশ্য হলো, দুর্ভিক্ষে শিশুরা মারা যায়। আমরা কখনো টেলিভিশনের পর্দায় কোনো দুর্দশাগ্রস্ত সাবালককে দেখব না, এমনকি যদি আমরা রোজ টেলিভিশনের খবর দেখি, তবুও না, তার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে এই দৃষ্টান্তরহিত কথাটাই যে দুর্ভিক্ষে কোনো বুড়ো মানুষ মারা যায় না।

আমরা অঙ্গীকার করে রেখেছি যে উপন্যাসটি অনুবাদ করব, পড়ব এবং পড়তে পড়তে খানিক আলোচনাও করব। একটুখানি কাটাছেঁড়া করে দেখব কুন্ডেরা উপন্যাসটা লিখছেন কী গঠনশৈলী অবলম্বন করে! গল্পের কথক (বা মিলান কুন্ডেরা) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিস থেকে এসে একটা হোটেলে উঠেছেন। এই যাত্রার সামান্য বিবরণই আমরা পাই। তার চেয়ে বেশি পাই তত্ত্ব-আলোচনা। আমরা ভিভাঁ দেনোঁর *নো টুমরো* (কোনো আগামীকাল নেই) উপন্যাস নিয়ে আলোচনা শুনি। *ডেঞ্জারাস লিয়াজোঁ* নামের আরেকটা উপন্যাস, যা কিনা চিঠির আকারে লেখা, তা নিয়ে আলোচনা করি। এর মধ্যে ভেরা আর আমাদের নায়ক (মিলান কুন্ডেরা) হোটেল রুমে এসেছেন। টেলিভিশনের পর্দার ছবির সূত্র ধরে এবার আমরা শুনছি দুর্ভিক্ষ ও আফ্রিকা বিষয়ে লেকচার। আসুন শুনতে থাকি।

অবশ্যই। সোমালিয়া! এই বিখ্যাত স্লোগানটি আমাকে ভুলে যাওয়া দেশের নামটিকে ফিরিয়ে দিল। আহা, কী করুণ ব্যাপার! পুরো ব্যাপারটা এরই মধ্যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে! বাচ্চারা অনেক বস্তা চাল কিনেছিল। অগণিত বস্তা। বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের মধ্যে বৈশ্বিক সংহতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারা টাকা দিয়েছিলেন। স্কুলগুলো এগিয়ে এসেছিল দুহাত বাড়িয়ে। স্কুলে স্কুলে চাল সংগ্রহ করা হচ্ছিল, বন্দরে পাঠানো হচ্ছিল, জাহাজে তুলে পাঠানো হচ্ছিল আফ্রিকার উদ্দেশে, আর প্রত্যেকেই অনুসরণ করতে পারছিল গৌরবময় চাউল-মহাকাব্যটাকে।

মুমূর্ষু শিশুদের পর এবার টেলিভিশনের পর্দা দখল করল দুই বালিকা, ৬ আর ৮ বছর বয়সী। তাদের বড়দের মতো করে কাপড় পরানো হয়েছে। তাদের ভাবভঙ্গি বড়দের মতো। ফ্লার্টিং। ওহ। কী সুন্দর, কী মর্মস্পর্শী, কী মজার! যখন ছোটরা বড়দের মতো ভাবভঙ্গি করতে থাকে। ছোট ছেলেমেয়েরা চুমু খায়। এবার এলেন এক ব্যক্তি, তিনি একটা শিশুকে দুহাতে কোলে নিয়ে বলছেন, কী করে তার শিশুর সদ্য-ভেজানো ন্যাপি সহজে পরিষ্কার করা যাবে। এরপর এলেন একজন সুন্দর নারী, তার জিব খুবই আবেদনময়ী, তিনি সেই জিব বাড়িয়ে দিলেন ন্যাপি পরিষ্কারক লোকটির সুশীল মুখে।

ভেরা বলে, ঘুমুতে এসো। সে সব বাতি বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

৫

আফ্রিকান বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য ফরাসি শিশুদের ছুটে আসা আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেয় বুদ্ধিজীবী বার্কের মুখ। তখন ছিল তাঁর গৌরবের দিন। পরাজয় প্ররোচিত করে গৌরব আনতে। আসুন স্মরণ করি বিশ শতকের আশির দশকে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল এক মহামারির আঘাতে, তার নাম ছিল এইডস, যা প্রধানত ছড়াত যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এবং বেশি ছড়িয়েছিল সমকামীদের মধ্যে। ধর্মান্ধরা

মনে করত, এটা হলো স্বর্গীয় উপযুক্ত শাস্তি। তারা এইডস রোগীদের এড়িয়ে চলত যেন তারা প্লেগের রোগী। তারই প্রতিবাদস্বরূপ সহনশীল মানুষেরা এগিয়ে এসেছিল ভ্রাতৃত্বের ডাক নিয়ে, তারা কষ্ট স্বীকার করছিল এটা দেখাতে যে রোগীদের সঙ্গে মেলামেশা করলেই এইডস ছড়ায় না। তারই অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবী বার্ক এবং জাতীয় সংসদের দুবিকিউ একটা দামি ফরাসি রেস্তোরাঁয় এইডস রোগীদের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। ভোজনপর্ব সুন্দর পরিবেশে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটা উদাহরণ সৃষ্টি করার এই সুযোগ হারানো চলে না। তাই জাতীয় সংসদের ডেপুটি দুবিকিউ ভোজন শেষে মিষ্টান্ন পরিবেশনের সময় ডেকে এনেছিলেন ক্যামেরা। ক্যামেরা দরজার সিঁড়িতে এসে পৌঁছেছে, তখনই দুবিকিউ একজন এইডস রোগীকে ধরে চেয়ার থেকে শূন্যে তুলে তার মুখে চুমু খেলেন। রোগীর মুখে তখনো গলা চকলেট লেগে আছে। বার্ক তো তখন পিছিয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ঘটনা একবার যখন ক্যামেরায় ধারণ করা হবে, চিত্রায়িত হবে, তখনই দুবিকিউয়ের এই মহান চুমু চিরকালের অমরতা লাভ করবে। বার্ক উঠে দাঁড়ালেন, তীব্রভাবে ভাবতে লাগলেন তিনিও কি একজন এইডস রোগীকে চুম্বন করবেন? কিন্তু এই হাতছানি থেকে নিজেকে তিনি দূরে রাখলেন। প্রথমত খানিকটা সময় তাঁর কাটল ভাবনায়, মনের গভীরে তিনি নিশ্চিত নন আসলেই এইডস রোগীকে চুমু খেলে সংক্রমণ হয় নাকি হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি তার দ্বিধা জয় করলেন, আচ্ছা এই ঝুঁকি নেওয়াই যায়। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, তিনি যদি চুমু খান ওই মুখে, তাহলে তা কখনোই অতটা মহান বলে বিবেচিত হবে না, কারণ তিনি নকল করছেন। তিনি ক্ষুদ্র হয়ে যাবেন, নকলকারী হবেন, তাঁর এই চুমু বরং আগের চুম্বনকারীকে আরও বেশি মহত্ত্ব দেবে। গৌরব দেবে। তিনি ঠিক করলেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বোকার মতো হাসতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তহীনতার সেই কয়েকটি মুহূর্ত তাঁর কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করে নিল। ক্যামেরা ছিল সেখানে। রাতের খবরে সমগ্র ফ্রান্স তাঁর মুখে প্রতিফলিত তিন কিস্তির অনিশ্চয়তা পড়ে ফেলতে পারল। তারা একযোগে হাসি চাপার চেষ্টা করল। এরপর শিশুরা সোমালিয়ার

BanglaBook.org

শিশুদের জন্য চালের বস্তা সংগ্রহ করতে গিয়ে বার্কের উদ্ধারে এগিয়ে এল সঠিকতম মুহূর্তে। তিনি জনগণের উদ্দেশে এই স্লোগান ছুড়ে মারার প্রতিটা সুযোগ কাজে লাগালেন—'কেবল শিশুরাই সত্যের মধ্যে বসবাস করছে।' তিনি উড়ে গেলেন আফ্রিকার একটি দেশে, একটা মাছি ভনভন করা কালো বালিকামুখের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন। তার সেই ছবি জগৎজোড়া বিখ্যাত হয়ে উঠল। এমনকি দুবিকিউয়ের চুমুর ছবির চেয়েও বার্কের ছবি বেশি বিখ্যাত হলো, কারণ একজন মরণাপন্ন শিশু একজন মরণাপন্ন বয়স্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দুবিকিউ এই সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি মনে করলেন না যে তিনি হেরে গেছেন। তিনি ঠিক করলেন, তিনি একটা মোমবাতি আনবেন, তিনি একজন খ্রিষ্টান, তিনি জানেন যে বার্ক নাস্তিক, কিন্তু মোমবাতির সামনে যেকোনো অবিশ্বাসীও মাথা নুইয়ে ফেলে। তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সময় পকেট থেকে মোমবাতি বের করলেন, তারপর সেটা প্রজ্বলিত করলেন, উদ্দেশ্য বার্ককে কোণঠাসা করা, বার্ক বিদেশের শিশুদের নিয়ে চিন্তিত, অথচ ফ্রান্সেই কত শিশু না খেয়ে আছে, আমাদের নিজেদের গরিব শিশুরা কত কষ্ট করছে, গ্রামে, উপশহরে। তিনি ডাক দিলেন, আসুন ভাইসব, আমরা একটা মিছিল করি, আমাদের শিশুদের জন্য, আমরা প্রত্যেকে হাতে করে আনব একটা করে মোমবাতি। তিনি (ভেতরের তামাশা গোপন রেখে) বার্ককে আহ্বান জানালেন সেই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিতে, মোমবাতি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। বার্কের সামনে দুইটা রাস্তা—এক, এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে দুবিকিউয়ের দোহারের ভূমিকা নেওয়া, না হলে এটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া এবং দুর্নামের ভাগী হওয়া। তিনি আরও সাহসী অপ্রত্যাশিত ভূমিকা নিলেন। তিনি উড়ে চললেন পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, একটা এশিয়ান দেশে, যেখানে মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় মরণপণ লড়াই করছে, তিনি সেই দেশে যাচ্ছেন, তিনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকারের পক্ষে সজোরে চিৎকার করবেন। কিন্তু তার ভূগোলের জ্ঞান ছিল খুব খারাপ, তার কাছে পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত, ফ্রান্স আর ফ্রান্স-নয়। তিনি প্লেন থেকে পা রাখলেন আরেকটা শান্ত, ক্লান্তিকরভাবে শান্তিপূর্ণ দেশে। সেই

BanglaBook.org

দেশে আছে শীতল পর্বত, তা এতই ঠান্ডা যে উড়োজাহাজ বন্ধ রইল মূল্যবান আটটি দিন। তারপর তিনি সর্দিকাশি আর পেট ভরা খিদে নিয়ে ফিরে এলেন প্যারিসে।

'বার্ক হলো নৃত্যশিল্পীদের শহীদ-রাজা।' এই মন্তব্য পঁতেভিঁর।

নৃত্যশিল্পী তত্ত্বটা পঁতেভিঁর অল্পসংখ্যক বন্ধুরই জানা। এটা তার সেরা আবিষ্কার। দুঃখের ব্যাপার, পঁতেভিঁ কোনো দিনও এই তত্ত্ব নিয়ে কিছু লেখেননি, কিংবা কোনো আন্তর্জাতিক সেমিনারে পেপার পড়েননি। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, তিনি সস্তা খ্যাতিতে বিশ্বাস করেন না। তার বন্ধুরা আরও আনন্দ আর আগ্রহ নিয়ে তার এসব তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করে থাকে।

প্রিয় পাঠক, আমরা একটা উপন্যাস পড়ছি। এক লোক (মিলান কুন্ডেরা) যে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটা হোটেলে উঠেছেন, সে কথা আমরা ভুলতেই বসেছি। এতক্ষণ আমরা বার্ক আর দুবিকিউ, এক বুদ্ধিজীবী আর এক রাজনীতিকের মজার বাহাস দেখলাম। এখন শুরু হবে, ও আমার পাঠক, এখন শুরু হবে পঁতেভিঁ নামের এক রেস্তোরাঁ কাঁপানো দার্শনিকের বড় বড় বুলি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬

আজকালকার সব রাজনীতিবিদের মধ্যেই কিছু পরিমাণ নৃত্যশিল্পী আছেন, পঁতেভিঁ বলেন, আর সব নৃত্যশিল্পীই রাজনীতিবিদ; তবে দুই দলকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। নৃত্যশিল্পীরা রাজনীতিবিদের চেয়ে আলাদা, কারণ তারা ক্ষমতা খোঁজেন না, তারা খোঁজেন গৌরব। তারা পৃথিবীর ওপরে কোনো সামাজিক কর্মসূচি চাপিয়ে দেন না, যদিও সেটাকে কম গুরুত্বপূর্ণও ভাবেন না। বরং নৃত্যশিল্পীরা মঞ্চকে বেছে নেন নিজের রশ্মি বিকিরণ করার ক্ষেত্র হিসেবে।

মঞ্চ দখল করে নেওয়ার জন্য দরকার হয় অন্যকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়ার। এ জন্য দরকার বিশেষ রকমের যুদ্ধের কৌশল। একজন নৃত্যশিল্পী যে যুদ্ধটা লড়েন, পঁতেভিঁ এর নাম দিয়েছেন 'নৈতিক জুডো', তিনি তার হাতের দস্তানা ছুড়ে মারেন সমস্ত পৃথিবীর দিকে; তার চেয়ে নীতিমান আর কে আছে? কে আছে তার চেয়ে সাহসীতর, ভদ্র, আত্মত্যাগী, ঐকান্তিক, সত্যপূর্ণ? তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেন অন্যকে তার চেয়ে হীনতর প্রমাণ করার জন্য।

একজন নৃত্যশিল্পী যদি রাজনীতির খেলায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেতেন, তাহলে তিনি প্রকাশ্যে সব গোপন চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতেন (যা আসল রাজনীতির মাঠে সব সময়ই থাকে), সেসব চুক্তিকে অভিহিত করতেন প্রতারণাপূর্ণ, অসৎ, ভণ্ড, নোংরা বলে; তিনি তার নিজের প্রস্তাবগুলোকে ঘোষণা করতেন প্রকাশ্যে, একটা মঞ্চে গাইতে গাইতে আর নাচতে নাচতে, তারপর নাম ধরে ধরে অন্যদের আহ্বান জানাতেন তার নিজের প্রস্তাবমতো কাজ করতে। আমি জোর দিচ্ছি, তারা আহ্বান জানাতেন প্রকাশ্যে। এবং সম্ভব হলে হঠাৎ করে। 'তুমি কি আমার মতো প্রস্তুত আছ সোমালিয়ার শিশুদের জন্য নিজের এপ্রিল মাসের বেতনটা দান করে দিতে?' অপ্রস্তুত অন্যদের সামনে তখন কেবল দুটো পথ খোলা থাকত হয় তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শিশুদের শত্রু হিসেবে নিজেকে হেয় করা, অথবা চরম অস্বস্তির সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলা, যা কিনা ক্যামেরা অসৎ উদ্দেশ্যে ধারণ ও প্রচার

BanglaBook.org

করত, যেমন করেছিল বেচারি বার্কের দ্বিধাসংকুল চেহারাটা দেখিয়ে, যখন তার সামনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে তিনি এইডস রোগীকে চুম্বন করবেন নাকি করবেন না! 'ডাক্তার এইচ, আপনি কেন নীরব, যখন আপনার দেশে মানবাধিকার পদদলিত?' ডাক্তার এইচকে এমন একটা সময় প্রশ্নটা করা হলো, যখন হয়তো তিনি অপারেশন থিয়েটারে, টেবিলে অজ্ঞান রোগী, তার পেট কাটা, তিনি সেলাই করবেন, তিনি জবাব দিতে পারলেন না, তিনি রোগীর কাটা পেট সেলাই করতে থাকলেন, তার এই নীরবতা লজ্জায় ঢেকে দিতে লাগল সবকিছু, সবকিছু ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল, তারপর তিনি একটা কিছু বললেন, তখন ওই নৃত্যশিল্পী, যিনি এসব বড় বড় কথা বলছেন, ছুড়ে মারলেন আরেকটা চপেটাঘাত : 'অবশেষে আচ্ছা দেরিতে হলেও তো তিনি একটা কিছু বলেছেন' (এটা ওই নৈতিক জুডোর আরেকটা প্যাঁচ, এবং বিশেষ শক্তিশালী প্যাঁচ)।

একনায়কতন্ত্রের সময়ে যেমন, কখনো কখনো এ রকম পরিস্থিতি আসতে পারে, যেখানে কোনো প্রকাশ্য পক্ষাবলম্বন হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক। কিন্তু একজন নাচিয়ের জন্য পরিস্থিতিটা কিছুটা কম বিপজ্জনক, কারণ সমস্ত পাদপ্রদীপের আলো এসে পড়ে তার ওপরে, সমস্ত পৃথিবী তাকে দেখছে। তা তাকে সুরক্ষা দেয়। এই নাচিয়ের অনেক মুগ্ধ ভক্ত আছে। তারা তার সুন্দর কিন্তু বিবেচনাহীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্মারকলিপিতে সই করে, গোপন নিষিদ্ধ সভায় যোগ দেয়, রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, এবং তাদের ওপরে দমন-নিপীড়ন নেমে আসে। কিন্তু নাচিয়ে কখনোই এই রকম আবেগপূর্ণ প্ররোচনার দ্বারা চালিত হন না, এ কথা ভাবেন না যে এই মানুষগুলোর এই বিপন্নতার জন্য তিনিই দায়ী, কারণ তিনি জানেন, একটা মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুই-চারজনের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতেই হবে।

পঁতেভিঁর সঙ্গে ভিনসেন্ট ভিন্নমত পোষণ করেন। 'আপনি যে বার্ককে দুই চোখে দেখতে পারেন না, সেটা সবাই জানে। এই বিষয়ে আমরা আপনার সঙ্গে আছি। যদিও লোকটা একটা গাধা। তবু তো সে সামনে কতগুলো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আর তার উদ্দেশ্যগুলোকে আমরা নিজেরাও সমর্থন করি। অবশ্য লোকটার মধ্যে ফাঁপা অহংকার আছে, তাও

BanglaBook.org

আমি মানছি, হয়তো তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের পেছনে আছে ফাঁপা হামবড়া ভাব। কিন্তু আপনি যদি কোনো গণবিতর্কে অংশ নিতে চান, কোনো ভয়াবহ জিনিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, কোনো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান, নিজেকে একজন নাচিয়ে না বানিয়ে বা নাচিয়ের মতো ভাবভঙ্গি না জেনে কীভাবে তা করবেন?'

রহস্যময় পঁতেভিঁ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তুমি যদি ভেবে থাকো আমি নৃত্যশিল্পীদের আক্রমণ করতে চেয়েছি, তাহলে ভুল করছো। আমি আসলে তাদের পক্ষে। যে কেউ নৃত্যশিল্পীদের অপছন্দ করেন, তাদের হেয় করতে চান, তাদের সামনে আসবে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা নৃত্যশিল্পীদের শালীনতা। একজন নাচিয়ে সারাক্ষণ থাকেন প্রকাশ্যে, সবার সামনে, তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে ওঠার ব্যাপারটাকে নিন্দা করেন, ফাউস্টের মতো তিনি শয়তানের সঙ্গে সন্ধি করেন না, তার সন্ধি দেবদূতের সঙ্গে। তিনি তার জীবনকেই একটা শিল্পকর্ম করে তোলেন, দেবদূতেরা তাকে সহায়তা করেন, কারণ নৃত্য ব্যাপারটা নিজে একটা শিল্প। নিজের জীবনকে একটা শিল্পের উপাদান হিসেবে দেখাটাই একজন নৃত্যশিল্পীর জীবনের সত্য সারবত্তা। তিনি নৈতিকতা প্রচার করেন না, তিনি তো নাচেন। তিনি তার নিজের জীবনের সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীকে নাড়াতে এবং ঝলকিত করতে চান। তিনি তার নিজের জীবনের প্রেমে পড়েন, যেমন করে একজন ভাস্কর তার ভাস্কর্যের প্রেমে পড়ে থাকেন।'

---

৬ নম্বর অধ্যায় শেষ হয় গেল। আপনাদের মনে আছে তো যে আমরা আসলে একটা শহরের বাইরের হোটেলে বেড়াতে গেছি, আমরা মানে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। হয়তো মিলান কুন্ডেরা নিজে আর তাঁর স্ত্রী ভেরা। তাঁরা হোটেল রুমে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আমাদের গল্প আছে সাহিত্যের, তারপর দর্শনের আলোচনায়। এখন আমরা একটা বকিয়ে দার্শনিককে পাচ্ছি, যিনি রেস্তোরাঁয় বসে শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করেন। বার্ককে আমরা ভুলে গেছি। এখন আমরা নাচিয়েদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের তুলনা আলোচনা করছি। দেখা যাক সপ্তম অধ্যায়ে কী হয়?

BanglaBook.org

পঁতেভিঁ তার এই মতবাদগুলো প্রকাশ-প্রচার করেননি। কোনো বই লেখেননি, সভা-সিম্পোজিয়াম করেননি। তার কাজের ব্যস্ততা ছিল, এমনও না। জাতীয় গ্রন্থাগারে তার অফিসকক্ষে বসে ইতিহাসের পিএইচডি এই ব্যক্তি বরং একঘেয়েমি বোধ করতেন। যদি বলা হয়, তত্ত্বের প্রচারে তিনি অনাগ্রহী ছিলেন, তাহলে কমই বলা হয়। তিনি প্রচারণাকে অপছন্দ করতেন। যে ব্যক্তি তার ধারণাকে জনসমক্ষে প্রচার করেন, তিনি একটা ঝুঁকি নেন, তার ধ্যানধারণা দিয়ে অন্যকে পটিয়ে ফেলতে চান, অন্যদের প্রভাবিত করেন, তারপর আবির্ভূত হন পৃথিবীকে বদলে দিতে চাওয়ার দলে। জগৎটাকে বদলে দেওয়া, পঁতেভিঁ মনে করেন, এ হলো এক রাক্ষুসে লক্ষ্য। এমন না যে পৃথিবীটা এখন সুন্দর আছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেকোনো পরিবর্তন জগতে অনিবার্যভাবে আরও খারাপই ডেকে আনে। যেকোনো নতুন চিন্তাই শেষ পর্যন্ত তার রচয়িতার কাঁধে এসে পড়ে। তখন ওই নতুন ধারণা আবিষ্কার করার যে আনন্দ ছিল তার, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই স্বার্থপরের মতন করে ভাবেন পঁতেভিঁ, তিনি হলেন এপিকিউরাসের সেরা শিষ্য। একটা নতুন চিন্তা করার আনন্দ পাওয়ার জন্যই তিনি চিন্তা করেন। এমন না যে তিনি মানবজাতিকে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন পৃথিবীটা অপরিবর্তনীয়। মানবজাতি আনন্দপূর্ণ কিন্তু বিদ্বেষে ভরা কতগুলো ভাবনামাত্র। তিনি তাদের কাছে যাওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন না। ক্যাফে গ্যাসকন নামের একটা ক্যাফেটেরিয়ায় তার নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন, এটাই তার জন্য মানবজাতির যথেষ্ট নমুনা।

এই বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ, সবচেয়ে সর্বাস্পর্শী হলো

BanglaBook.org

ভিনসেন্টের ব্যাপারটার ভালো দিকও আছে। তারা দুজন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে—দর্শন, রাজনীতি, বই।

ভিনসেন্ট পছন্দ করে পঁতেভিঁর সঙ্গে একা থাকতে। নানা ধরনের উদ্ভট উসকানিমূলক আইডিয়ায় টইটম্বুর ভিনসেন্টের মাথা। পঁতেভিঁও তাতে মুগ্ধ, তার শিষ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, তাকে উৎসাহ দেন, অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু তৃতীয় কেউ এসে পড়লে ভিনসেন্ট অখুশি হয়। কারণ, তখন পঁতেভিঁ খুব তাড়াতাড়ি বদলে যান, বেশি জোরে কথা বলতে শুরু করেন আর বিনোদনমূলক কথা বলতে থাকেন। এত বেশি বিনোদনমূলক হওয়াটা ভিনসেন্টের রুচিতে বাধে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তারা ক্যাফেতে। দুজনই। ভিনসেন্ট জিগ্যেস করে, 'সোমালিয়ায় কী হচ্ছে, আপনি আসলে কী মনে করেন?' পঁতেভিঁ ধৈর্য ধরে গোটা আফ্রিকা বিষয়ে একটা লেকচার দেন। ভিনসেন্ট শোনে, আপত্তি জানায়, তারা যুক্তিতক্কোগপ্পে মাতে, কৌতুকও করে, এ রকম একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটু কৌতুক করলেও খুব বেশি হালকা করে না বিষয়টাকে।

তখন আসে মাচু। তার সঙ্গে একজন অপরূপা। অপরিচিতা। ভিনসেন্ট তখনো গম্ভীর কণ্ঠে বলে চলেছে, 'পঁতেভিঁ, আপনি যা বলছেন, এই ব্যাপারটা, এটা কি ভুল হচ্ছে না ...', ভিনসেন্ট তার গুরুর মতের বিপরীতে আরেকটা মত দাঁড় করানোর চেষ্টা চালায়।

পঁতেভিঁ একটা দীর্ঘ বিরতি নেন। তিনি দীর্ঘ বিরতি নিতে ওস্তাদ। তিনি জানেন, আত্মবিশ্বাসহীনেরাই কেবল বিরতি নিতে ভয় পায়। তারা

BanglaBook.org

উঠেছেন? তিনি কি মিলান কুন্ডেরা নিজে? হ্যাঁ। তিনি গল্পের কথক এবং তিনি মিলান কুন্ডেরা নিজে। বইয়ের শেষের দিকে গিয়ে আমরা এটা জানতে পারব। যখন তাঁর মা তাঁকে তাঁর নামের সংক্ষেপিত রূপ 'মিলানকু' ধরে ডাকবেন।

কত কী আলোচনা শুনেছি আমরা! উপন্যাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি। বার্কের কথা ভুলে গেছি। পঁতেভিঁতে এসেছি। ভিনসেন্টে এলাম। এপিকিউরাসকে আবার পেলাম। চলতে থাকুক। দেখা যাক কোথাকার গল্প কোথায় যায়।

যে বিষয়ে জানে না, তা নিয়েও তাড়াতাড়ি কথা বলতে যায় এবং ভুল করে, নিজেদের হাস্যকর করে তোলে। পঁতেভিঁ জানেন, কী করে নীরব থাকতে হয়, রাজরাজসিক নীরবতা, সমস্ত ছায়াপথও তখন অধীর আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, অপেক্ষা করে তিনি কখন মুখ খুলবেন। কোনো কথা না বলে পঁতেভিঁ তাকালেন ভিনসেন্টের দিকে। কোনো কারণ ছাড়াই ভিনসেন্ট চোখ নামিয়ে ফেলল। তখন পঁতেভিঁ মৃদু হাসলেন, সদ্য আগত সুরূপা নারীটির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'ভিনসেন্ট, তোমার এই চালাকি ভরা যুক্তি, একজন নারীর উপস্থিতিতে, এটাই কেবল প্রমাণ করে যে তোমার লিবিডোতে একটা ফোঁটা পড়ল।'

মাচুর মুখটা আহাম্মকের বিখ্যাত হাসিতে ভরে ওঠে। নারীটি ভিনসেন্টের দিকে মজা আর পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টিতে তাকান। ভিনসেন্ট লাল হয়ে যায়। আহত বোধ করে। একটু আগে যিনি ছিলেন তার বন্ধু, তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছিলেন, এখন কেবল একজন নারীকে মুগ্ধ করবেন বলে তাকেই অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়ার জন্য লক্ষ্য বানালেন।

তখন আসে অন্য বন্ধুরা। তারা গল্পগুজব করে। মাচু একটা গল্প বলে। গুজা তার বইপড়া বিদ্যা ঝাড়ে। মেয়েরা হাসিতে কলকলিয়ে ওঠে। পঁতেভিঁ নীরব থাকেন, অপেক্ষা করেন কখন তার অপেক্ষার মেওয়া পাকবে, তারপর বলেন, 'আমার গার্লফ্রেন্ড সব সময় চান আমি যেন তার সঙ্গে বুনো হয়ে উঠি।'

ও খোদা, তিনি জানেন কী করে কথা পাড়তে হয়। এমনকি পাশের টেবিলের লোকজনও চুপ করে যায়, কান খাড়া করে, কী বলবেন পঁতেভিঁ। হাসি থেমে যায়। কী এমন ঘটনা, যে তার গার্লফ্রেন্ড তাকে সব সময় বুনো হতে বলে! এই জাদুটা নিহিত আছে পঁতেভিঁর কণ্ঠস্বরে। ভিনসেন্ট ঈর্ষা বোধ করেন। তার নিজের গলা তার তুলনায় কিছুই না, বাঁশির মতো চিকন। কেবল বেহালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো। পঁতেভিঁ কথা বলেন নম্রভাবে, কখনো গলায় জোর ফোটান না, যা সমস্ত রুমটাকে ভরিয়ে তোলে, জগতের অন্য সকল শব্দকে শ্রুতির অযোগ্য করে তোলে।

পঁতেভিঁ বলেই চলেন, 'আমাকে বলে বুনো হও, খ্যাপা হও, কিন্তু আমি তো তা হতে পারি না, আমি খ্যাপা নই, আমি তো স্নিগ্ধ।'

রুমের মধ্যে হাসিহুল্লোড় এখনো জীবন্ত। সেই প্রাণটুকু উপভোগ করার

BanglaBook.org

জন্য, আয়েশটুকু নেওয়ার জন্য পঁতেভিঁ আবারও বিরতি দেন।

আবার পঁতেভিঁ মুখ খোলেন। বলেন, 'আমার বাড়িতে মাঝেমধ্যে একজন টাইপিস্ট মহিলা আসেন। একদিন, একেবারেই শুভ ইচ্ছা থেকে, আমি তার চুল ধরে তাকে শূন্যে তুলে ধরি, তাকে সোজা নিয়ে যাই বিছানায়, তারপর মাঝপথে আমি তাকে ছেড়ে দিই, হাসতে থাকি, মাদাম, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে চণ্ড হতে বলেছে, আপনি তো বলেননি।'

সমস্ত ক্যাফে হেসে ওঠে। ভিনসেন্টও যোগ দেয় সেই হাসিতে। ভিনসেন্ট আবারও তার শিক্ষকের প্রেমে পড়ে।

সপ্তম অধ্যায় শেষ হলো। আমি, অনুবাদক, আপনাদের শুধু খেয়াল করতে বলব, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে। সেই যে প্যারিস থেকে বেরোল এক দম্পতি। তারা ধীরে চলার বদলে গতি কেন, এই নিয়ে কথা বলছিল। তারপর আমরা দুটো উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। হেডোনিজম নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করেছি। কথা বলেছি সোমালিয়ার শিশুদের নিয়ে। এক রাজনীতিবিদ আর এক পণ্ডিতের বাহাস নিয়ে গল্প শুনেছি। এবার এলাম পঁতেভিঁর সঙ্গে প্যারিসের ক্যাফেতে।

এই উপন্যাসে তাহলে গল্প কই? কেন্দ্রীয় প্লট কই? কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? কারা? আমরা পড়তে পড়তে এগোই। দেখা যাক, অধ্যায় আটে কী হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮

পরের দিন ভিনসেন্ট একজন সমালোচকের মতো করে বলে, 'পঁতেভিঁ, আপনি শুধু নাচিয়েদের বিষয়ে বিশাল তত্ত্বের জন্মদাতা নন, নিজেও একজন বড় নাচিয়ে।'

কিছুটা বিব্রত হয়ে পঁতেভিঁ বলেন, 'তুমি তত্ত্বটাকে গুবলেট করে ফেলছ।'

ভিনসেন্ট : 'যখন আপনি আর আমি থাকি, তখন দুজনে একসঙ্গে থাকি, কিন্তু যে-ই তৃতীয় কেউ এসে পড়ে, তখন সে আর আমি নিচে দর্শকসারিতে চলে যাই, আপনি উঠে পড়েন মঞ্চে, মঞ্চে উঠে নাচতে থাকেন।'

পঁতেভিঁ : 'আমি তোমাকে বলি, তুমি তত্ত্বটাকে গুবলেট বানিয়ে ফেলছ। যারা পাবলিক লাইফে আছে, "নাচিয়ে" টার্মটা কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য। তুমি জানো, পাবলিক লাইফ আমি কতটা ঘৃণা করি।'

ভিনসেন্ট আপনি গতকাল ওই মহিলার সামনে সেই রকম আচরণ করেছেন, যা বার্ক ক্যামেরার সামনে করেছিলেন। আপনি ওই মহিলার সমস্ত মনোযোগ আপনার নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন শ্রেষ্ঠ বলে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান হিসেবে। আপনি নাচিয়ের প্রদর্শনবাদিতার অশ্লীলতম জুডো লড়েছেন আমার সঙ্গে।'

পঁতেভিঁ 'প্রদর্শনবাদিতার জুডো! হতে পারে। কিন্তু সেটা কোনো নৈতিকতার জুডো ছিল না। আর সেখানেই তুমি ভুল করছ আমাকে একজন নাচিয়ে বলে। কারণ, একজন নাচিয়ে সব সময় অন্য যে কারও চেয়ে বেশি নীতিনিষ্ঠ হতে চায়। অন্যদিকে আমি তোমার চেয়ে হীনতর হতে চেয়েছি।'

ভিনসেন্ট 'একজন নাচিয়ে অধিকতর নীতিনিষ্ঠ হতে চায়, কারণ তার বিপুল দর্শক আনাড়ি, তারা মনে করে নীতিনিষ্ঠ কাজই কেবল সুন্দর। আর আমাদের দর্শকসংখ্যা কম, তারা একটু উল্টাপাল্টা আছে, তারা আবার নীতিহীনতাকেই বেশি পছন্দ করে। তাই আপনি আমার ওপরে নীতিহীন জুডো চাপিয়ে দিয়েছেন, সেটা আপনার ওই নাচিয়ের চরিত্রের সঙ্গে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়।'

পঁতেভিঁ (হঠাৎ করে তার কণ্ঠস্বর বদলে ফেলেন, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বলতে

BanglaBook.org

থাকেন) 'আমি যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি, ভিনসেন্ট আমাকে ক্ষমা করো।'

ভিনসেন্ট (সঙ্গে সঙ্গে, পঁতেভিঁর ক্ষমাপ্রার্থনায় আবেগপ্রবণ হয়ে) 'আমার তো ক্ষমা করার কিছু নেই। আমি জানি, আপনি ঠাট্টা করছিলেন।'

তারা যে গ্যাসকন নামের ক্যাফেতে মিলিত হন, সেটা আচমকা ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়। এদের সেন্ট হলেন দ আরতাগনঁ। বন্ধুত্বের সেন্ট। বন্ধুত্বকে তারা খুবই পবিত্র বলে মনে করেন।

পঁতেভিঁ বলেন, 'যদি ব্যাপারটাকে বড় করে দেখি, তোমার কথার মধ্যে তো একটা পয়েন্ট আছে, সেইভাবে দেখলে প্রতিটা মানুষের মধ্যেই একটা করে নাচিয়ে আছে। আর একজন নারীকে দেখলে অন্য যেকোনো কারও চেয়ে আমার ভেতরে ঢের বেশি, দশজন নাচিয়ে জেগে ওঠে। আমার কিছুই করার নেই। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু বেশিই হয়।'

ভিনসেন্ট অমায়িকভাবে হাসতে থাকে। পঁতেভিঁ অনুতপ্ত স্বরে বলেন, 'যদি আমি সত্যি নাচিয়ে বিষয়ের বিশাল একজন তাত্ত্বিক হয়ে থাকি, একটু আগে যে স্বীকৃতি তুমি আমাকে দিয়েছ, তাহলে সেই নাচিয়ের কিছুটা স্বভাব আমার মধ্যে আছে, তা না হলে আমি তাদেরটা বুঝতে পারলাম কীভাবে? আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি, ভিনসেন্ট।'

পঁতেভিঁ আবারও অনুতপ্ত বন্ধু থেকে তাত্ত্বিক গুরুতে পরিণত হন। তিনি বলেন, 'শোনো, ভিনসেন্ট, আমার মধ্যে যদি নাচিয়ের কিছু থেকে থাকে, তা খুবই সামান্য, শুধুই এই কনসেপ্টটাকে আমি মেনে নিচ্ছি, আসলে নাচিয়ের কিছুই আমার নেই। এটা শুধু একটা সম্ভাবনা নয়, এটাই সত্য যে একজন বার্ক কিংবা একজন দুবিকিউ, একজন প্রকৃত নাচিয়ে কখনোই একজন নারীকে পটানোর চেষ্টা করতে গিয়ে এই গল্প ফেঁদে বসবে না, যেমনটা আমি বললাম, যে একজন তার টাইপিস্টকে চুমো টেনে বিছানার দিকে নিয়ে গেছে, কারণ সে এই মেয়েকে অন্য মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল। কারণ তার সামনে যে দর্শক, তা নির্দিষ্ট দৃশ্যমান উপস্থিত একজন নারীমাত্র নয়, তার দর্শক হলো অদৃশ্য, অসংখ্য অগণন মানুষ। শোনো, আরেকটা নতুন চ্যাপ্টার তৈরি করতে হবে নাচিয়ে তত্ত্বের, আর তা হলো, দর্শকদের অদৃশ্য থাকার ব্যাপারটা। এই চরিত্রের যে সাংঘাতিক

BanglaBook.org

একটা আধুনিকতা আছে, সেটা এখানেই নিহিত। একজন নাচিয়ে কেবল তোমার বা আমার জন্য দেখানোপনা করছেন না, তিনি সমস্তটা পৃথিবীকে শো অফ করছেন। আর পুরোটা পৃথিবী মানে কী? মুখ নেই, এ রকম অসংখ্যজন, একটা বিমূর্ত ব্যাপার!'

তাদের আলাপের এই পর্যায়ে গুজা আসে, মাচু আসে। দরজা থেকেই গুজা বলতে থাকে, 'ভিনসেন্ট, তুমি না পতঙ্গবিদ সম্মেলনে যেতে চাও, তোমার জন্য বিশাল খবর আছে, বার্ক সেখানে যাচ্ছে।'

পঁতেভিঁ 'আবার! সে সর্বত্রই বিরাজমান!'

ভিনসেন্ট 'খোদার ওয়াস্তে সে সেখানে কী করবে?'

মাচু : 'তুমি নিজে একজন পতঙ্গবিদ। তুমিই ভালো জানবে।'

গুজা 'সে যখন ছাত্র ছিল, তখন এনটোমোলজি ডিপার্টমেন্টে কিছু সময় কাটিয়েছে। এই সম্মেলনে তাকে পতঙ্গবিদের সাম্মানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে।'

পঁতেভিঁ 'আমাদের ওইখানে যেতে হবে। নরক বানাতে হবে।' (ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে) 'তুমি আমাদের সবাইকে ওখানে চুরি করে ঢুকিয়ে দেবে।'

প্রিয় পাঠক, হোটেল রুমে ভেরা ঘুমাচ্ছে, সে কথা ভুলে যান। আমরা বরং ভিনসেন্ট আর পঁতেভিঁর এসব কথোপকথন উপভোগ করি। কুন্ডেরার সেন্স অব হিউমার অসাধারণ। পাণ্ডিত্যও অতুলনীয়। সরলতারও কোনো জুড়ি নেই। কাজেই চলুন এগোনো যাক। নবম অধ্যায়ে আমরা ভেরার দেখা পাব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৯

ভেরা ঘুমিয়ে আছে। আমি বাগানের দিকের জানালাটা খুলি। ভাবতে থাকি মাদাম দে টি এবং তরুণ শেভালিয়ের অভিসার নিয়ে। তারা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে গেল, তিনটা পর্বে ভাগ করা একটা যাত্রা সম্পন্ন করল।

তারা হাতে হাত রেখে চলে, তারা কথা বলে, লনে একটা বেঞ্চ ছিল, তারা তাতে বসে। তারা গল্প করতেই থাকে। চাঁদের আলোয় ভরা রাত। তারা হাতে হাত রেখে গল্প করেই চলে। সেন নদীর দিকে নেমে গেছে বাগানের চত্বরগুলো। নদীর কল্লোলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পাতার মর্মর। আসুন, আমরা তাদের কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ তুলে নিই। শেভালিয়ে একটা চুমু চায়। মাদাম জবাব দেন, 'আমিও চাইছি। আমি যদি প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে তুমি পুরোটাই বৃথা হয়ে যাবে। তোমার আত্মমর্যাদা তোমাকে ভাবাবে যে আমি তোমাকে ভয় পাই।'

মাদাম দে টি যা বলেন, তার সবই শিল্পপ্রসূত। কথা বলার শিল্প। মন্তব্য ছাড়া কোনো আচরণ নয়। কাজ আর কথার মিল অবশ্য না-ও থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, শেভালিয়ে চুমু চাইল। মাদাম তা বরাদ্দ করলেন। কিন্তু তা করলেন এ বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়ার পর। আবার তা এমন যেন শেভালিয়ের গর্ব ব্যাহত না হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস দিয়ে মাদাম যখন একটা চুম্বনকে প্রতিরোধের একটা অংশে পরিণত করে, তাতে কেউই কিন্তু ঠকে না। শেভালিয়েও না। কিন্তু শেভালিয়েও মাদামের কথাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে, কারণ তারা একটা মানসিক প্রক্রিয়ার ভেতরে আছে, যে প্রক্রিয়া প্রত্যুত্তরে চায় আরেকজনের মানসিক প্রক্রিয়া। কথোপকথন সময়কে পার করার একটা উপায় নয়, এটা সময়কে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে তোলে, সময়কে শাসন করে, নিজের আইন জারি করে যা মান্য করা উচিত সশ্রদ্ধভাবে।

ওই অভিসারের রাত্রির প্রথম পর্বের শেষে কী হয়? মাদাম যে চুমুটা বরাদ্দ করেছিল শেভালিয়ের জন্য, যাতে সে নিজেকে বৃথা মনে না করে,

BanglaBook.org

আরেকটা চুমু ডেকে আনে। আরও আরও চুমু। আরও চুমু খুব জরুরি, কথাকে কেটেছেঁটে, কথাকে সরিয়ে দিয়ে। তারপর হঠাৎ করে মাদাম থামে আর সিদ্ধান্ত নেয় ঘুরে দাঁড়ানোর।

আহ! কী মঞ্চকলা! অনুভূতির প্রাথমিক দ্বিধার শেষে এটা দেখানো দরকার হয়ে পড়েছিল যে ভালোবাসার আনন্দ এখনো পাকা ফলের মতো হয়ে ওঠেনি। এর দাম বাড়াতে হবে। এটাকে আরও কাম্য করে তুলতে হবে। একটা বাধা আসতে হবে। একটা উত্তেজনা দরকার হবে। একটা সাসপেন্স। প্রাসাদে ফেরার সময়টাতে মাদাম একটা ভান করে যে তারা কিছুই করবে না। আসলে সে জানে যে সে পরিস্থিতিটা পুরো পাল্টে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তাদের এই মিলনমুহূর্তটিকে সে শুধু একটু দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। যা লাগবে, তা হলো একটি কথা, একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়া, শত বছরের পুরোনো শত কথার ভেতর থেকে। কিন্তু কথা আর কাজের স্রোতের মধ্যে, প্রেরণার অপ্রত্যাশিত অভাবের মধ্যে তার মনে একটা কথাও আসছে না। তার অবস্থা হলো সেই অভিনেতার মতো, যে কিনা তার নাটকের সংলাপ ভুলে গেছে। আসলেই তাকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা মনে করতে পারতে হবে। এটা তো আজকের যুগের মতো নয়। আজকের দিনে কী হয়, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে বলে, 'তুমিও এটা চাও, আমিও এটা চাই, সময় নষ্ট না করে এসো কাজটা সেরে ফেলি।' তাদের দুজনের খোলামেলা মনোভাব এখনো একটা পর্দায় ঢাকা, যে পর্দা তারা ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। যদিও তারা নিজেদের মনে করে সংস্কারমুক্ত। মুক্তমনা। তারা তাদের হেঁটে চলার জন্য যদি কোনো কথা খুঁজে না পায়, এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে তারা তাদের প্রাসাদে ফিরে যাবে নীরবতার যুক্তির স্বাভাবিক টানে। তারপর তারা পরস্পর থেকে বিদায় নেবে। তারা যতই অনুভব করছে একটা কথা খুঁজে পাওয়ার, আর জোরে তা বলার তাগিদ, ততই যেন সেলাই করে দিচ্ছে তাদের মুখ। আহা, এই দুজনকে কথা জোগাও। অথচ কথারা পালিয়ে যাচ্ছে। যেন তাদের সাহায্য করা দরকার। তারা যখন প্রাসাদের দরজায় পৌঁছাল, উপন্যাসের কথক বর্ণনা করছেন, 'তখন পারস্পরিক তাড়না থেকে, আমাদের চলা ধীর হয়ে এল।'

BanglaBook.org

ভাগ্য ভালো, সেই সময়ে নাটকের প্রম্পটার মাদামের মুখের সংলাপ ধরিয়ে দিল। মাদাম শেভালিয়েকে আক্রমণ করল, 'আমি তোমার ওপরে বেজায় অখুশি।' অবশেষে! অবশেষে। বাঁচা গেল। মাদাম রাগান্বিত। এই কপট রাগ তাদের হাঁটাটাকে দীর্ঘায়িত করবে। মাদাম তো ছেলেটির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশছে। তাহলে শেভালিয়ে কেন তাকে বলেনি যে তার প্রেমিকা আছে, সে হলো কমতেস! জলদি জলদি! এটা হলো কথা চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ। তাদের অবশ্যই কথা চালিয়ে যেতে হবে। আবারও কথা শুরু হলো। কথা চলতেই থাকল। তারা প্রাসাদের গেট থেকে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। তারা এবার ভালোবাসার বন্ধনহীন গ্রন্থিতে গিয়ে পৌঁছাল।

হায়, প্রিয় পাঠক, ভেরা ঘুমিয়ে আছে। লেখক জানালা খুললেন আর চলে গেলেন মাদাম ও শেভালিয়ের সেই প্রাচীন উপন্যাসের বর্ণনায়। একেই কি বলে উপন্যাস?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১০

মাদাম যখন গল্প করছিল, চারপাশ দেখে নিচ্ছিল, মেপে নিচ্ছিল, ভেবে নিচ্ছিল পরে কী কী করতে হবে, তার সঙ্গীকে সুযোগ দিচ্ছিল এটা ভাবতে যে এরপর কী বলতে হবে, কী করতে হবে। মাদাম এটা করছিল সুস্মিতভাবে, আভিজাত্যের সঙ্গে এবং পরোক্ষভাবে, যেন সে অন্য কোনো কিছু নিয়ে কথা বলছে। শেভালিয়ের একটা প্রেম আছে, কমতেসের সঙ্গে, তার কথাও মাদাম পাড়ে, যেন যুবকটা এই ব্যাপারে ধাতস্থ হয়, বিশ্বস্ততার কর্তব্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, মাদামের মনে যে একেবারে বিপরীত একটা ফন্দি আছে, সেটাতে যেন সে ভারমুক্তভাবে অংশ নিতে পারে। মাদাম যে কেবল আশু ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে তা কিন্তু না, সে দেখতে পাচ্ছে অতি দূরের ভবিষ্যৎ, সে শেভালিয়েকে এই ধারণা দিয়ে রাখছে যে ভবিষ্যতে সে কমতেসির প্রতিযোগিনী হতে যাচ্ছে না। কাজেই শেভালিয়ের উচিত হবে না কমতেসিকে পরিত্যাগ করা। সে যুবককে একটা স্বল্পমেয়াদি কোর্স করায় ভালোবাসার ওপরে। আবেগীয় শিক্ষা বিষয়ে। ভালোবাসার ব্যাপারে তার যে বাস্তব দর্শন, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় শেভালিয়েকে। সে তাকে শেখায় যে নৈতিকতার বিধির অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোপনীয়তার শর্ত দিয়ে সুরক্ষিত রাখতে হবে সবকিছু। সকল পুণ্যের ধারণা থেকে মুক্ত থাকাই হলো আসল পুণ্য। এবং মাদাম খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকে এটাও শেখাল যে পরদিন যখন তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন কী রকম ব্যবহার করতে হবে।

আপনারা কি বিস্মিত হচ্ছেন? ভাবছেন, এই যে একটা মানচিত্র, যা খুবই যুক্তি দিয়ে সাজানো, নকশা করা, হিসাব করা, পরিকল্পিতভাবে আঁকা, মাপা, সেখানে স্বতঃস্ফূর্ততা, পাগলামো, ঘোরগ্রস্ততা, কামনার অন্ধত্ব, পাগলামোতে পরিপূর্ণ ভালোবাসার স্থান কোথায়, যার কথা সুররিয়ালিস্টরা আদর্শায়িত করে গেছেন, কোথায় সেই নিজেকে হারানো? আমরা ভালোবাসা বলতে যে অযৌক্তিক কাণ্ডকারখানার গুণাবলিকে বুঝিয়ে থাকি,

BanglaBook.org

সেসব কোথায়? না। এখানে সেসবের কোনো জায়গা নেই। কারণ মাদাম টি হলো যুক্তিশৃঙ্খলার রানি। মার্কিস দে মেরতির নিঠুর যুক্তিবাদ নয় এটা, এ হলো নরম, ভদ্র যুক্তিবাদ, এই হলো সেই যুক্তিবাদ, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ভালোবাসাকে রক্ষা করা।

আমি দেখতে পাচ্ছি, সে শেভালিয়েকে চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে নিয়ে চলেছে। এবার সে থামল। যুবাটিকে দেখাল ওই যে দেখো একটা কুটিরের ছাদ দেখা যাচ্ছে। আহ, কী একটা কামুকতাপূর্ণ মুহূর্ত দেখল এই দোচালাটা। আহা, কী করুণ কথা, সে বলল, এই ঘরের চাবি তার কাছে নেই। তারা দরজার দিকে গেল। কী আজব! কী অপ্রত্যাশিত! ঘরটার দরজা খোলা।

কেন সে বলল চাবি আনেনি? কেন সে বলল না এই ঘরে বহুদিন আসলে তালাচাবি দেওয়া হয় না? সবকিছুই আগে থেকে লিপিবদ্ধ করা। বানিয়ে তোলা। কৃত্রিম। সবকিছু সাজানো নাটক। কোনো কিছু সোজাসাপ্টা নয়। বা অন্য কথায়, সবকিছুই শিল্প। এই ক্ষেত্রে সাসপেন্স দীর্ঘায়িত করার শিল্প। আরও ভালোভাবে বলা যায়, যত দীর্ঘক্ষণ পারা যায় কামোত্তেজনা ধরে রাখার শিল্প।

প্রিয় পাঠক, আমরা কিন্তু একটা উপন্যাস পড়ছি, যার নায়ক একটা হোটেলে আছে নায়িকা ভেরাকে নিয়ে। ভেরা ঘুমাচ্ছেন। আর নায়ক জানালা দিয়ে বাগান দেখছেন। কোথায় সেসবের বর্ণনা? আমরা একটা পুরোনো উপন্যাসের গঠনশৈলী নিয়ে আলোচনা করছি। ১১ নম্বর অধ্যায়ে আসুন। দেখা যাক সেখানে কী ঘটে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১১

মাদাম দে টির শারীরিক অবয়বের বর্ণনা দেননি দেনো। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, মাদাম ক্ষীণাঙ্গি ছিল না। আমার কল্পনায় তার ছিল সুগোল সুষম কটিদেশ, ল্যাকলোর উপন্যাস 'ডেঞ্জারাস লিয়াজোঁ'য় আকর্ষণীয় নারীশরীরের যে বিবরণ আছে, সে রকম করে যদি বলি। আর সেই শারীরিক গোলাকৃতি তার চলায়-বলায় ভঙ্গিতে একটা গোল গোল ভাব, একটা ধীরতা নিশ্চয়ই দেয়, একটা ধীরতা উদ্ভাসিত হয়। সুস্থিরতার প্রজ্ঞা আছে তার, সবকিছুকে ধীর করে ফেলার সমস্ত কৌশল সে প্রয়োগ করে। এই কৌশল সে প্রয়োগ করে রাতের দ্বিতীয় ভাগে, যখন তারা ছিল চালাঘরে, তারা সেই ঘরে ঢুকল, তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল, তারা বিছানায় ঢলে পড়ল, তারা মিলিত হলো। কিন্তু 'এসবই ঘটল একটু বেশি তাড়াহুড়া করে। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারলাম আমরা যখন বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়ি তখন সূক্ষ্মতা হারাই। আমরা ইন্দ্রিয় পুলকের পেছনে ছুটি, ফলটি দাঁড়ায়, আমরা পথের বহু আনন্দকে ঝাপসা করে ফেলি।'

যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তারা ধীরতা হারাল, সেটাকে তারা দুজনেই ভুল বলে স্বীকার করে। কিন্তু আমি মনে করি না যে মাদাম দে টির জন্য কোনো চমক ছিল। বরং সে জানত যে এই ভুল অনিবার্য, এ রকমটা ঘটতে বাধ্য, সে এমনটাই প্রত্যাশা করছিল, এই জন্যই সে চালাঘরের পর্বটাকে একটা গতিনিরোধক হিসেবে ব্যবহার করেছিল, ঘটনা দ্রুত ঘটে যাওয়াতে বিরতি দিতে, তাকে মার্জিত করতে, যা কিছু ঘটবেই, যা কিছু ঘটে গেছে, তাকে ধীরতা দিতে। যখন তৃতীয় পর্ব এল, নতুন একটা পরিবেশে, তখন তারা রাত্রিটাকে যাপন করল চমৎকার ধীরতা-মন্থরতা দিয়ে।

চালাঘরে সে মিলনে বিরতি নেয়। শেভালিয়েকে নিয়ে আরও খানিকটা হাঁটে। লনের মাঝখানে বেঞ্চে বসে। আবারও গল্প জুড়ে দেয়। তারপর তাকে প্রাসাদঘরে নিয়ে যায়। তার নিজের বাসগৃহের পাশে একটা গোপন ঘরে যায় তারা। এটাকে তার স্বামী জাদুকরি প্রেমের মন্দির হিসেবে সাজিয়ে রেখেছে। শেভালিয়ে দরজার মুখে থামে, ঝলকানিতে অন্ধ হওয়ার উপক্রম

BanglaBook.org

তার, চারদিকে অনেক আয়না, দেয়াল জোড়া আয়নার মধ্যে অগণন জুটি পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। কিন্তু এখানে তারা মিলিত হলো না। মাদাম চায় তাদের কামনা, উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হোক। তারা গেল পাশের আরেকটা ঘরে। গুহার মতো অন্ধকার। নরম গদি। সেখানেই তারা সঙ্গম করে। ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ ধরে। দিনের অবসান পর্যন্ত।

রাতের এই অধ্যায়গুলোকে ধীরতা দিয়ে, এগুলোকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে নিয়ে, একটা পর্ব থেকে আরেকটাকে আলাদা করে রেখে, মাদাম টি একটা ক্ষুদ্র সময়পর্বকে চমৎকার ছোট্ট স্থাপত্যকীর্তিতে উন্নীত করতে সমর্থ হয়। একটা সময়খণ্ডের ওপরে একটা গড়ন চাপিয়ে দেওয়া কেবল সৌন্দর্যের চাওয়া নয়, এটা মানুষের স্মৃতিরও দাবি। যার কোনো গঠনশৈলী নেই, তাকে তো তুমি ধরতে পারবে না, তাকে স্মৃতিতেও ধরে রাখতে পারবে না। তাদের এই মিলনটাকে একটা গড়ন দেওয়া তাদের জন্য খুবই মূল্যবান, কারণ তাদের এই নিশীথের কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। এই একটা রাত কেবল স্মৃতিতেই ফিরে পাওয়া সম্ভব।

ধীরতার সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক আছে। ভুলে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে গতির। একটা খুব সাধারণ ঘটনার কথাই ধরি। একটা লোক রাস্তায় হাঁটছে। সে একটা কিছু মনে করতে চায়। কিন্তু মনে পড়ছে না। তখন সে তার হাঁটার গতি কমিয়ে দেবে। আরেকজন একটা ঘটনা ভুলে যেতে চাইছে। তখন সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেবে। যেন সে চেষ্টা করছে তার স্মৃতি থেকেই দূরে সরে যেতে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

অস্তিত্ববাদী গণিতে এই অভিজ্ঞতা দুটো মৌলিক সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায় স্মৃতির গভীরতা ধীরতার সমানুপাতিক। ভুলে যাওয়ার হার গতির সঙ্গে সমানুপাতিক।

আমরা হোটেল রুম কিংবা ভেরাকে ভুলে গেছি। জানালা দিয়ে বাগান দেখতে গিয়ে সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা করছি। সুবিধা হলো, এটা করতে আমাদের ভালো লাগছে। আলোচনাটা আমরা উপভোগ করছি।

BanglaBook.org

১২

ভিভাঁ দেনোঁর জীবদ্দশায় হয়তো খুব অল্প কজন বন্ধু জানতেন যে তিনি 'পয়েন্ট দে লেদেঁরমেঁ'র রচয়িতা। তার মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত কথাটা গোপনই ছিল। ফলে বইটির নিজের ইতিহাস এ বইয়ে বলা কাহিনির সঙ্গে মিলে যায়। ছায়ান্ধকার ঘোমটার আড়ালে ছিল এটা। গোপনীয়তা, বিচ্ছিন্নতা, রহস্যমেদুরতা, নামহীনতার উপচ্ছায়া ঘিরে ছিল বইটাকে।

দেনোঁ ছিলেন খোদাইকারী, নকশাকারী, কূটনীতিবিদ, পর্যটক, শিল্পের সমঝদার, গুনিন, একটা চমৎকার পেশাগত জীবনের অধিকারী। কিন্তু তিনি কোনো দিনও এই উপন্যাসিকাটির শৈল্পিক পিতৃত্ব দাবি করেননি। এমন না যে তিনি খ্যাতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তার সময়ে খ্যাতির অন্যতর মানে ছিল। আমি কল্পনা করতে পারি, তিনি যে পাঠকদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, যাদের মনে করতেন চমৎকার, তারা আজকের লেখকদের ঈপ্সিত অজানা পাঠকবর্গ নয়, বরং যে অল্প কজন মানুষকে তিনি নিজে চিনতেন-জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তারা। একটা সেলুনে কয়েকজন মানুষের সামনে নিজেকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তিনি কয়েকজন মাত্র পাঠককে নিয়ে সেই একই রকম আনন্দই পেতেন।

আলোকচিত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগের খ্যাতি আর পরের খ্যাতি এক নয়। চেক রাজা ওয়েনসেসলস চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাগে ছদ্মবেশে সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে গল্প করতেন। তার ছিল ক্ষমতা, খ্যাতি, স্বাধীনতা। কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রিন্স চার্লসের কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আছে অপরিসীম খ্যাতি। কোনো মনুষ্যশূন্য অরণ্যে কিংবা মাটির সতেরো তলা নিচের কোনো বাথটাবে তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। খ্যাতি তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। এখন তিনি জানেন, সম্পূর্ণ অসচেতন জনতা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সেলিব্রিটিদের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয় অনুসরণ করাটাকে অনুমোদন করে।

আপনি বলতে পারেন, যদিও খ্যাতির ধরন বদলে গেছে, তবু এটা শুধু কতিপয় সুবিধাভোগী মানুষেরই চিন্তার বিষয়। আপনি ভুল করছেন। খ্যাতি

BanglaBook.org

কেবল একজন বিখ্যাত মানুষের বিষয় নয়, এটা আপনার-আমার প্রত্যেকের বিষয়। আজকালকার দুনিয়ায় খ্যাতিমানেরা আছেন টেলিভিশনে, আছেন পত্রপত্রিকায়। তারা আমাদের কল্পনাকে দখল করে নেন। প্রত্যেকে তাদের মতো হতে চায়, স্বপ্ন দেখে তাদের মতো বিখ্যাত হওয়ার। প্রত্যেকে এই সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখে। (অবশ্য চেক রাজা ওয়েনসেসলসের খ্যাতি নয়, যিনি গরিব মহল্লায় ঢুকে গরিবের সঙ্গে কথা বলছেন, মানুষ চায় প্রিন্স চার্লস হতে, যিনি কিনা সতেরো তলা মাটির নিচের বাথটাবে লুকিয়ে থাকবেন)। এ সম্ভাবনা প্রতিটি মানুষের ওপরে ছায়াপাত করে, তাদের জীবনাচার বদলে দেয়। এটা অস্তিত্ববাদী গণিতের আরেকটা সুপরিচিত উপপাদ্য। অস্তিত্ব যখনই কোনো নতুন সম্ভাবনা অর্জন করে, তা অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিটা জিনিসকে বদলে দেয়।

১৩

অবশ্য পঁতেভিঁ একটা ঘটনা জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে বার্কের প্রতি তিনি এতটা রূঢ় হতেন না। বার্কের একজন সহপাঠিনী ছিল। একই স্কুলে পড়ত। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন ইমাকুলাতা। তাকে পছন্দ করতেন বার্ক। এই নারী বেশ যন্ত্রণা দিয়েছে বার্ককে।

বিশ বছর পরে একদিন ইমাকুলাতা টেলিভিশনের পর্দায় দেখল বার্ককে। দেখল বার্ক একজন কালো ছোট বালিকার মুখ থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। এই দৃশ্য আলো জ্বালাল ইমাকুলাতার হৃদয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি হলো, বার্ককে সে চিরটাকাল ভালোবেসে এসেছে। ওই দিনই সে একটা চিঠি লিখল বার্ককে, বহু আগের নিষ্পাপ প্রেমের কথা স্মরণ করল সে। কিন্তু বার্কের মনে আছে, তাদের প্রেম মোটেও নিষ্পাপ ছিল না। তার প্রেমে ছিল কামনার আগুন। কিন্তু মেয়েটি তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই কারণে বার্ক তাদের পর্তুগিজ মা-বাবার গৃহপরিচারিকার নামে এই মেয়ের নাম রেখেছিলেন ইমাকুলাতা, যার মানে হচ্ছে দাগবিহীন। এই চিঠি বার্কের

BanglaBook.org

মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল মারাত্মক। কিন্তু তিনি চিঠির জবাব দিলেন না।

বার্কের নীরবতা মেয়েটিকে ব্যথিত করে তুলল। পরের চিঠিতে সে বার্ককে স্মরণ করিয়ে দিল কত কত প্রেমপত্র বার্ক লিখেছিলেন এই তাকে। স্মরণ করিয়ে দিল, বার্ক তার নাম দিয়েছিলেন 'স্বপ্নসংহারী রাতের পাখি'। এই রকম আহাম্মকের মতো কথা লিখেছিলাম নাকি, বার্ক ভাবলেন। এই মেয়েকে তো নিবৃত্ত করা দরকার।

তার মনে হলো, এই মেয়ে কেন এটা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, এ তো সৌজন্যের পরিচায়ক নয়। পরে তার কানে যেসব জনশ্রুতি এসে পৌঁছাচ্ছিল, তা থেকে তিনি জানতে পারেন, এই মহিলা যতবার তাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে, ততবারই নৈশভোজের সময় অনেক বেশি কথা বলেছে। সে কথা বলেছে বার্ক সম্পর্কে, যিনি কিনা এই মেয়েটির জীবনে দাগ লাগাতে পারেননি, অথচ মেয়েটিকে ভেবে তার রাতের ঘুম দুঃস্বপ্নে নষ্ট হয়েছে। বার্কের মনে হলো, তিনি উদোম হয়ে পড়েছেন, তার কোনো রক্ষাকবচ নেই। জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, খুব ভালো হতো যদি তার কোনো নাম-পরিচয়ই না থাকত!

তৃতীয় চিঠিতে ভদ্রমহিলা একটা সাহায্য চাইল, তার নিজের জন্য নয়, তার কোনো এক পড়শির জন্য। তার এক গরিব-অসহায় পড়শি হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এমনকি মরতে বসেছিল, তাকে চেতনানাশক দেওয়ার সময় ডাক্তাররা ভুল করেছিল। এখন সে কোনো ক্ষতিপূরণও পাচ্ছে না। বার্ক কি একবার এই মহিলার কাছে যেতে পারেন? তিনি তো আফ্রিকার শিশুদের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। এখন একজন ফরাসি দুস্থ নারীর কাছে কি তিনি যেতে পারেন না? অবশ্য এখানে কোনো টেলিভিশন ক্যামেরা থাকবে না।

এই গরিব মহিলা শেষে নিজেই চিঠি লেখে। চিঠিতে সে ইমাকুলাতার কথা রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করে। বলে, এই হচ্ছে সেই দাগবিহীন কুমারী বালিকা, যে কিনা আপনার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে জ্বালাতন করত। এও কি সম্ভব? একি সম্ভব? নিজের ফ্ল্যাটে বার্ক এক মাথা থেকে আরেক মাথা পায়চারি করেন। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করেন। তিনি চিৎকার করেন, রাগে ফেটে পড়েন। চিঠির টুকরোগুলোয় থুতু ছোড়েন। সেগুলোকে

BanglaBook.org

ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেন।

একদিন এক টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধানের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন এক প্রযোজক তার জীবনকাহিনি নির্মাণ করতে চায়। বার্ক খুবই মুশকিলে পড়েন। কারণ, তিনি নিজে টেলিভিশনে আবির্ভূত হতে চান। নিজের জীবনকে শিল্পে উন্নীত করতে চান। কিন্তু টেলিভিশনের প্রযোজক আর কেউ নয়, ইমাকুলাতা নিজে। এখন তিনি কী করবেন? ঘটনা তো একটা কমেডিতে পরিণত হলো। তিনি তখন টেলিভিশনের প্রধানকে বললেন, না, না, আমার তো বয়স কম, এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার বয়স আমার হয়নি। টেলিভিশন প্রধান বার্কের বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মিলান কুন্ডেরার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি নারীকে দেখেন পুরুষের চোখ দিয়ে। তাঁর লেখা পুরুষবাদী, সুতরাং নারীবিদ্বেষী। আমরা সে অভিযোগের পক্ষে কিছু প্রমাণ এই বইয়েও পাচ্ছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৪

এই গল্প আমাকে আরেকটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। গুজা তার অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি দেয়াল বানিয়ে রেখেছেন লাইব্রেরি। একদিন যখন আমার রাগ কোনো কারণে তার সামনে প্রকাশ করে ফেলছিলাম, তিনি তার লাইব্রেরির একটা তাক দেখালেন, যেটাতে তিনি ফলক লিখে রেখেছেন, 'অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া রসিকতাসমূহের মাস্টারপিস'। এক নারী সাংবাদিকের বই, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত, কিসিঞ্জারের জন্য ভালোবাসা নিয়ে লেখা, আপনারা যদি কিসিঞ্জারের নাম মনে রেখে থাকেন, তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপদেষ্টা, যিনি ভিয়েতনাম-আমেরিকার মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছিলেন।

গল্পটা এ রকম

নারীটি কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রথমে একটা ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে। তারপর একটা টেলিভিশনের হয়ে। তারা কয়েকবার বৈঠক করে, কিন্তু সবই হয়েছিল পেশাদারির সীমা কঠোরভাবে মান্য করে। একটা-দুটো নৈশভোজ, তা ছিল টেলিভিশনে প্রচারের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, হোয়াইট হাউসে দু-তিনবার যাওয়া, বাড়িতে যাওয়া—কখনো একা, কখনো ক্রুদের সঙ্গে নিয়ে। কিসিঞ্জার তাকে অপছন্দই করতেন। তিনি তো আর বোকা ছিলেন না। মেয়েটিকে দূরে রাখার জন্য তাকে তিনি শোনালেন সেই সব গল্প—কী করে মেয়েরা ক্ষমতার কাছাকাছি আসে, কেমন করে তার পেশাগত জীবন তাকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে দূরে দূরে রাখে।

নারীটি এই সমস্তই খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে, কিন্তু এই সব কথায় তার ভালোবাসা কমে না, সে নিরুৎসাহিত না হয়ে বরং স্থির করে ফেলে যে তারা দুজনে দুজনার। কিসিঞ্জারকে কি মনে হচ্ছিল একটু সাবধান এবং অবিশ্বস্ত? নারীটি তা নিয়ে বিস্মিত নয়। এর আগে যে সমস্ত মেয়ের সঙ্গে কিসিঞ্জারের দেখা হয়েছিল, তারা তো আসলে তার যোগ্য ছিল না। মেয়েটি বিশ্বাস করতে শুরু করে, একবার যদি কিসিঞ্জার বুঝতে

BanglaBook.org

পারেন সে তাকে কত বেশি ভালোবাসে, তাহলেই তিনি তার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসবেন, তার দুর্ভাবনা ও প্রতিরোধ থেকে সরে আসবেন। আহা, নিজের ভালোবাসার পবিত্রতা নিয়ে নারীটি কী নিশ্চিতই না ছিল! সে কসম কেটে বলতে পারে, তার দিক থেকে এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো যৌনতা ছিল না। 'যৌনতা? তিনি আমাকে শীতল করে ফেলতেন।' সে লিখেছিল। একজন মেয়ের মতোই স্যাডিজম নিয়ে সে লেখে, বারবার, যে তিনি খুব খারাপ কাপড়চোপড় পরেন। তার নারীরুচি খুব খারাপ। তিনি হ্যান্ডসাম নন। তিনি অবশ্যই প্রেমিক হিসেবে খুব খারাপ! তারপরেও সে তাকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে থাকে। মেয়েটির দুই সন্তান, কিসিঞ্জারেরও তা-ই। সে একসঙ্গে ছুটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে, তিনি পারেন না। মেয়েটি কোট দি আজু যেতে চায় ছুটিতে একসঙ্গে। মেয়েটি খুশি, তাহলে দুই ছোট কিসিঞ্জার ফরাসি ভাষাটা খানিক চর্চা করতে পারবে।

একদিন মেয়েটি তার ক্যামেরা ক্রুদের পাঠিয়ে দেয় কিসিঞ্জারের বাড়িতে। কিসিঞ্জার আর সহ্য করতে পারেন না। লোকগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন। আরেক দিন তিনি মেয়েটিকে তার অফিসে ডেকে পাঠান। তার কণ্ঠস্বর ছিল কঠিন, শীতল। তিনি তাকে জানিয়ে দেন, অনেক হয়েছে, তার এই সব রহস্যময় আচরণ তিনি আর সহ্য করবেন না। মেয়েটি প্রথমে খুব হতাশ হয়। এরপর সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। মেয়েটি কিসিঞ্জারের জন্য রাজনৈতিক বিপদ ডেকে আনতে পারে। কিসিঞ্জারের গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই তাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। যে রুমে তারা দেখা করছেন, সেই রুমেই তো আছে অনেক ক্যামেরা অনেক মাইক্রোফোন। পুলিশ সব দেখছে-শুনছে। কাজেই কিসিঞ্জারের তো এভাবেই কথা বলা উচিত। মেয়েটি তার দিকে করুণভাবে হাসিমুখে তাকায়। তার মনে হয়, ট্র্যাজেডির আলো জ্বলে উঠেছে। আর কিসিঞ্জারের অসহায় চাউনিতেও নিশ্চয়ই ভালোবাসার নিবেদনই ফুটে উঠেছে।

গুজা হাসেন। কিন্তু আমি তাকে বলি, মেয়েটির ফ্যান্টাসির মধ্যে যে স্পষ্ট সত্যটা লুকিয়ে আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সত্য খুবই তুচ্ছ, আক্ষরিক সত্য। যা আসল জিনিসটাকে আড়াল করছে। তা হলো এই

BanglaBook.org

বইটা। এই বইয়ের সত্য মহান, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তারা দুইজন যখন একটা টেবিলের দুধারে বসে ছিলেন, তখন এই দুজনের মধ্যে ছিল এই অদৃশ্য বইটা। মেয়েটি এরপর যা করবে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল এই বইটাই। এই বইটা কেন? কিসিঞ্জারের জীবনকাহিনি বলার জন্য। কক্ষনো না। মেয়েটি তার নিজের প্রতি নিজের যে ভালোবাসা তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছে। সে তো বলেইছে যে প্রেমিক হিসেবে কিসিঞ্জার ভালো না। কিসিঞ্জারের শরীরের প্রতি তার কোনো প্রেম ছিল না। তার নিজের জীবনের সত্যই তাকে আকর্ষণ করেছিল। সে তার সামান্য জীবনকে অসামান্য করতে চেয়েছিল, এটাকে আলোয় আলোয় উজ্জ্বল করতে চেয়েছিল। মেয়েটি কিসিঞ্জারকে ভেবেছিল রূপকথার পঙ্ক্ষীরাজ ঘোড়া, যে তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

গুজা কথা সংক্ষেপ করতে আমার মুখের দিকে ব্যঙ্গভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েটি একটা বোকা।'

'না না। আরও সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে, যারা বলছে মেয়েটি বোকা নয়। এটা বোকামোর থেকে আলাদা। মেয়েটি নিজেকে একজন "নির্বাচিত" বলেই কল্পনা করতে শুরু করেছিল।'

১৫

'নির্বাচিত'। এই যে সাংবাদিক মেয়েটি নিজেকে মনে করেছে 'নির্বাচিত'। 'ইলেক্ট'। 'নির্বাচিত' কথাটার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। একজন 'নির্বাচিত' ব্যক্তি কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রতিভার কারণে নির্বাচিত নন। এটা ঈশ্বরের একটা স্বাধীন, খেয়ালি সিদ্ধান্ত, একটা অতিলৌকিক বিচারের মধ্য দিয়ে তিনি চয়িত হন। তার নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে, যা অনন্যসাধারণ, ব্যতিক্রমধর্মী। এই বিবেচনা থেকেই সাধুসন্তগণ তাদের ওপরে নেমে আসা অসহ্য অত্যাচারও সহ্য করেন। এই আধ্যাত্মিক চিহ্নগুলো মহৎদের জীবনের প্যারোডির মতো আমাদের সাধারণ মানুষদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

BanglaBook.org

আমরা প্রত্যেকেই জীবনে কমবেশি কষ্টে ভুগি। আমরা তা থেকে মুক্তি চাই। আকুল হয়ে উঠি। আমরা নিজেদের স্তর থেকে উঁচুতর স্তরে উন্নীত হই। আমাদের মধ্যে একটা কুহক কাজ করে, ভ্রান্তি যে আমরা আসলে যা, তার চেয়ে বড় স্তরের জন্য যোগ্য, নিয়তি আমাদের বড় কিছুর জন্য বাছাই করে রেখেছে।

'ইলেক্ট' বা 'নির্বাচিত'—এই অনুভূতি প্রতিটা প্রেমের সম্পর্কের মধ্যেই উপস্থিত। কারণ, প্রেমের সংজ্ঞাই হলো, কোনো কারণ ছাড়াই প্রেম হলো আসল প্রেম। তোমাকে আমি ভালোবাসি, এর কোনো কারণ নেই, সেটাই হলো ভালোবাসার আসল প্রমাণ। যখন একজন মেয়ে এসে আমাকে বলে, তোমাকে ভালোবাসি কারণ তুমি বুদ্ধিমান, কারণ তুমি ভদ্র, কারণ তুমি আমাকে সুন্দর সুন্দর উপহার কিনে দাও, কারণ তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াও, আমি হতাশ হই। এই ধরনের ভালোবাসা আমার কাছে মনে হয় স্বার্থপর। আহা, এর বদলে কত ভালোই না হতো, যদি আমি শুনতে পেতাম, তোমাকে আমি ভালোবাসি, যদিও আমি জানি, তুমি বুদ্ধিমান নও, ভদ্র নও, যদিও তুমি একজন মিথ্যুক, আত্মকেন্দ্রিক, হারামজাদা, তা সত্ত্বেও আমি তোমার জন্য পাগল।

সম্ভবত একজন শিশু হিসেবেই আমরা এই 'নির্বাচিত' বা 'ইলেক্ট' হওয়ার বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতাটা লাভ করি, আমাদের মায়েরা আমাদের অকারণে অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখান। তখন আমরা আরও বেশি মনোযোগ দাবি করে বসি। একজনকে বড় করে তোলার সময় এই জাতীয় ভ্রম থেকে তাকে মুক্ত রাখা উচিত, তাকে বুঝতে দেওয়া উচিত তুমি যা পাচ্ছ, তার প্রতিটির একটা দাম আছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে যায়। আপনি অনেক সময় দেখবেন, যখন দশ বছরের একটা মেয়ে তার ছোট্ট বন্ধুদের ওপরে কিছু একটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন যুক্তি দেখাতে না পেরে সে চিৎকার করে ওঠে, এটা করতে হবে, কারণ আমি এই রকমটাই চাই। কিংবা আমি বলেছি, ব্যস, এটাই হবে। কারণ সে নিজেকে 'নির্বাচিত' বলে গণ্য করছে। কিন্তু একটা দিন আসবে, যখন সে বলবে, এই রকম হবে, কারণ আমি এ রকম হবে বলছি, তখন তার চারপাশের সবাই হাসতে শুরু করবে। যখন কেউ একজন নিজেকে

BanglaBook.org

ভাবে 'নির্বাচিত', তার কী-ইবা আছে, যা দিয়ে সে প্রমাণ করবে যে সে নির্বাচিত, কীভাবে সে প্রমাণ করবে যে সে পালের মধ্যে আরও একজন সাধারণ মানুষ নয়?

এই দুর্দশা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য এল এক নতুন যুগ, ফটোগ্রাফির যুগ। সঙ্গে নিয়ে এল তারকাদের, নৃত্যশিল্পীদের, নিয়ে এল সেলিব্রিটিদের। তাদের প্রতিবিম্ব বিশাল বিশাল পর্দায় প্রতিফলিত হতে লাগল, সবাই সেসব দেখছে, প্রশংসা করছে, আর সেসব সাধারণের নাগালের কত বাইরে! বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্য মুগ্ধ আকর্ষণের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে গণ্য করে 'ইলেক্ট' বা 'নির্বাচিত' হিসেবে, তখন সে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনন্যসাধারণ হিসেবে, দূরত্ব রচনা করতে চায় সাধারণের থেকে, সাধারণ মানে তার সহকর্মী, প্রতিবেশী, পার্টনার—এমন সব মানুষ, যাদের সঙ্গেই বসবাস করতে সে বাধ্য!

এভাবে বিখ্যাত মানুষেরা হয়ে পড়ে একটা গণসম্পত্তি, যেন সে একটা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, যেন সে একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বা বিমা বা পাগলাগারদ। কিন্তু তারা ততক্ষণ পর্যন্তই কাজে লাগে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্যিকার অর্থে নাগালের বাইরে থাকে। যখন কেউ তার 'ইলেক্ট' বা 'নির্বাচিত' মর্যাদাটাকে নিশ্চিত করার জন্য কোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছাকাছি যায়, তখন সে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি নেয়। যে অভিজ্ঞতা এই সাংবাদিক মেয়েটি কিসিঞ্জারকে ভালোবেসে লাভ করেছে। আধ্যাত্মিক ভাষায় এটাকেই বলা হয় স্বর্গচ্যুতি। এই কারণে এই নারী তার বইয়ে কিসিঞ্জারের সঙ্গে তার ভালোবাসাকে সঠিকভাবে, স্পষ্টভাবে অভিহিত করেছে ট্র্যাজিক বলে, কেননা স্বর্গচ্যুতি ব্যাপারটা সব সময়েই ট্র্যাজিক।

বার্কের প্রেমে সে পড়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাকুলাতা তা উপলব্ধি করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু আর দশটা নারীর মতো সাধারণ জীবনই যাপন করত, কয়েকটা বিয়ে, কয়েকটা বিবাহবিচ্ছেদ, কয়েকজন প্রেমিক, যারা এত শান্ত আর সহজপ্রাপ্য যে তার জীবনে সচরাচর হতাশা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। তার সর্বশেষ প্রেমিকটি তাকে খুব পূজা করত। ইমাকুলাতা তাকে অন্যদের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যই মনে করেছিল।

BanglaBook.org

সে কেবল বাধ্যই ছিল না, সে ছিল উপকারী, কারণ মেয়েটি কাজ শুরু করেছিল টেলিভিশনে আর ছেলেটি ছিল ক্যামেরাম্যান। ছেলেটি তার চেয়ে একটু বেশি বয়স্ক ছিল। সে ছিল একান্ত বাধ্য পূজারি ছাত্রের মতো। মেয়েটিকে সে মনে করত সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে সংবেদনশীল।

ছেলেটি ভাবত, মেয়েটির সংবেদনশীলতা জার্মান রোমান্টিক চিত্রকরদের আঁকা প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের মতো, কল্পনাতীত উঁচু-নিচু জমিনে ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা, তার ওপারে সুনীল আকাশ, যেখানে ঈশ্বর থাকেন, ছেলেটি যখনই এই ল্যান্ডস্কেপে পা রাখে, তার ভেতরে এক দুর্মর তাড়না আসে যেন সে বসে পড়বে হাঁটু মুড়ে এবং সেখানেই স্থির থাকবে। যেন সে একটা স্বর্গের অতিলৌকিক খেলা দেখছে।

কথা ছিল, আমরা কেবল কুন্ডেরার *স্লোনেস* উপন্যাসটি অনুবাদ করব না, এর গঠনশৈলী নিয়ে কথা বলব। মিলান কুন্ডেরা আমাদের সময়ের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। প্রতিবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সময় আমরা আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করে থাকি যে সাহিত্যে কুন্ডেরা নোবেল পুরস্কার পান কি পান না। এই চেক লেখক *জোক* বা *ঠাট্টা* উপন্যাস লিখে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। *ঠাট্টা* ছিল সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়ার শ্বাসরোধী ব্যবস্থার সমালোচনা করে লেখা এক দুঃখের কাহিনি। এরপর আমরা তার অনেক উপন্যাস পড়েছি, গল্প পড়েছি। আমার নিজের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তার প্রবন্ধের বই, *দ্য আর্ট অব দ্য নভেল*। সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে তিনি আরও কয়েকটা নন-ফিকশন বই প্রকাশ করেছেন। যা-ই হোক, *স্লোনেস*ও তার একটা বিখ্যাত উপন্যাস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় বইটির ইতিবাচক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখন আমরা যা খেয়াল করছি, এখন পর্যন্ত এই উপন্যাসের নিজের কোনো গল্প নেই। নায়ক-নায়িকা গাড়ি করে প্যারিস ছেড়ে হোটেলে থাকবে বলে বেরিয়েছিল, তারা একটা হোটেলে উঠেছেও, কিন্তু আমরা আলোচনা করছি সাহিত্য নিয়ে, দর্শন নিয়ে। এর মধ্যে কিসিঞ্জারের প্রেমে পড়া এক নারী সাংবাদিকের লেখা এ-সম্পর্কিত বই নিয়েও আমরা আলোচনা করে ফেলেছি। দেখা যাক, কুন্ডেরা ১৬ নম্বর অধ্যায়ে এসে কী নিয়ে আলোচনা করেন।

১৬

রুমটি ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ফরাসি পতঙ্গবিদেরা আছেন। বিদেশিরাও এসেছেন। একজন চেক এসেছেন। কমিউনিজমের পতনের পর নতুন শাসনামল চলছে যে দেশটিতে, হয়তো সেই দেশের কোনো মন্ত্রী হবেন তিনি। বা বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান বা কমপক্ষে সদস্য হতে পারেন। যা-ই হোন না কেন, এই বিজ্ঞানী সমাবেশে তিনিই সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক ব্যক্তি। কারণ, তিনি এসেছেন এক নতুন ইতিহাসের প্রতিনিধি হিসেবে। সময়ের কুয়াশা কমিউনিজমকে সরিয়ে দিয়েছে। গুঞ্জনরত ভিড়ের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, একা, লম্বা। লোকেরা তার কাছে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। কিন্তু তাদের কথা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে, চারটা মাত্র বাক্য হয়ে গেলেই মনে হচ্ছে আর কোনো কথা নেই। তারা বুঝতে পারছে না আর কী বলা যায়। কারণ, তাদের কোনো অভিন্ন আলোচ্য বিষয় নেই। ফরাসিরা তাড়াতাড়ি তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি ফরাসিদের কথা খেয়াল করেন, তারপর বলা শুরু করেন, 'অন্যদিকে আমাদের দেশে ঘটনা ঘটে এ রকম' কিন্তু কেউই তার দেশ নিয়ে ভাবিত নয়। কারও আগ্রহ নেই এ কথা শুনতে যে, 'অন্যদিকে আমাদের দেশে ঘটনা ঘটে এ রকম' তিনি সরে যান, তার মুখটা বিষাদে ঢেকে যায়, কিন্তু তিনি ঠিক অসুখীও নন, তার মনের ভাবটা হলো, আচ্ছা ঠিক আছে, এদের আচরণে যুক্তি আছে, আমি না হয় একটু এদের পিঠ চাপড়েই দিলাম।

সবাই যখন কথা বলতে বলতে লবিতে যাচ্ছে, বারে দাঁড়াচ্ছে, এই চেক ভদ্রলোক তখন একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকলেন, এখানেই কনফারেন্সটা হবে, চারটা টেবিল চারদিকে বিছিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র বানানো হয়েছে। দরজার পাশে একটা টেবিল। টেবিলে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা। তার পাশে তারই মতো একজন একলা পড়ে যাওয়া তরুণী। বিজ্ঞানী মেয়েটির কাছে যান। নিজের নাম বলেন। মেয়েটি নামের উচ্চারণ বুঝতে পারে না।

BanglaBook.org

আবার নাম বলতে হয়। মেয়েটি এবারও বুঝতে না পেরে তালিকার ওপরে চোখ বোলাতে থাকে, নিশ্চয়ই একটা নাম পাওয়া যাবে, যার উচ্চারণ এই ভদ্রলোকের নামের মতো হবে। তৃতীয়বার কাউকে নাম জিগ্যেস করা যায় নাকি!

পিতৃসুলভ সদিচ্ছা নিয়ে বিজ্ঞানী টেবিলে ঝুঁকে কাগজে চোখ বুলিয়ে নিজের নামের ওপরে আঙুল রেখে বললেন, 'এই যে আমার নাম।'

'আহ, মঁসিয়ে শেচোরিপি?' তরুণীটি বলে।

'এটার উচ্চারণ চেখোজিপস্কি।'

'ওহ। এটা বেশ কঠিন একটা নাম।'

'ঘটনাচক্রে নামটা ঠিকভাবে লেখাও হয়নি।' বিজ্ঞানী কলম তুলে নেন, তার নামের দুটো অক্ষর সি এবং আরের মধ্যে ওপরে একটা ছোট্ট টান দেন, যা দেখতে একটা ঊর্ধ্বকমার মতো।

সেক্রেটারি মেয়েটা সেই দাগটার দিকে একবার বিজ্ঞানীটির দিকে তাকায়, বলে, 'আহ, বেশ কঠিন আছে।'

'একদম না। খুব সোজা।'

'সোজা?'

'তুমি নিশ্চয়ই জ্যান হাসকে চেনো?'

মেয়েটি আবার কাগজে তালিকার নামের দিকে তাকায়। চেক বিজ্ঞানী তাড়াতাড়ি করে বলতে থাকেন, 'তুমি জানো, চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন একজন বিশাল সংস্কারক, চার্চের সংস্কারক, লুথারের পূর্বসূরি, লুথারকে চেনো তো, চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেটা, তুমি জানো। কিন্তু যা তুমি জানো না, জ্যান হাস ছিলেন একজন বিশাল বানানতত্ত্ববিদ। তিনি বানানকে সহজ করে দিয়েছেন। তোমাদের ভাষায় দরকার হয় তিনটা অক্ষর—t, c, h। জার্মান ভাষায় লাগে চারটা অক্ষর—t, s, c, h; কিন্তু জ্যান হাস কী করলেন, তিনি মাত্র একটা অক্ষর ব্যবহার করলেন, c, তার ওপরে একটা ছোট্ট রেফের মতো বসিয়ে দিলেন। ব্যস হয়ে গেল।'

বিজ্ঞানীটি আবারও টেবিলের ওপরে উপুড় হলেন, কাগজ-কলম

BanglaBook.org

নিলেন, তালিকার নিচে তিনি একটা c লিখলেন বিশাল বড় করে, তার ওপরে একটা ছোট্ট রেফের মতো চিহ্ন বসিয়ে দিয়ে বললেন, হয়ে গেল 'Tch!'

সেক্রেটারিটা বিজ্ঞানীর চোখে তাকাল, বলল, 'Tch!'

'হ্যাঁ। একদম ঠিক!'

'এটা তো খুব কাজের। খুব খারাপ, তোমার দেশের বাইরে কেউ লুথারের এই সুন্দর সংস্কারের কথা জানেই না!'

'লুথার নয়। জ্যান হাস। তবে আর কোনো দেশে কেউ এটা জানে না, তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশের বাইরে একটা দেশে এটা ব্যবহৃত হয়। তুমি জানো সেটা কোন দেশ?'

'না। জানি না।'

'লিথুয়ানিয়া।'

'লিথুয়ানিয়া!' সেক্রেটারিটি বিড়বিড় করে। এই দেশ পৃথিবীর কোন প্রান্তে সে জানেই না।

'এবং লাটভিয়াতেও এটা আছে। তাহলে তুমি দেখো কেন আমরা চেক নাগরিকেরা এই ছোট্ট একটা দাগ নিয়ে এত গর্বিত। আমরা সব ছাড়তে রাজি আছি, কিন্তু এই ছোট্ট একটা দাগ ছাড়ব না, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও এই একটা ছোট্ট দাগকে আমরা রক্ষা করে যাব।'

তিনি সেক্রেটারি মেয়েটার সামনে মাথাটা একটু নোয়ালেন, তারপর চললেন চারদিকে চারকোনা করে বসানো টেবিলের দিকে। টেবিলে অংশগ্রহণকারীদের নামের ফলক বসানো। তিনি নিজের নাম খুঁজে বের করলেন। তারপর সেটার দিকে তাকালেন দুঃখী চোখে। কিন্তু এটাই তো হওয়ার কথা। নামের ফলকটা তুলে নিয়ে তিনি চললেন সেক্রেটারির কাছে।

এরই মধ্যে আরেকজন বিজ্ঞানী চলে এসেছেন এই অভ্যর্থনা টেবিলে। তিনি তার নাম খুঁজছেন। চেক বিজ্ঞানীকে আসতে দেখে সেক্রেটারি মেয়েটি বলল, 'একটা মিনিট, মঁসিয়ে চিপিকি!'

চেক বিজ্ঞানী এমন ভাব দেখালেন যে তিনি ব্যাপারটা বুঝছেন! 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার তো কোনো তাড়া নেই, মিস!' তিনি ধৈর্য

BanglaBook.org

ধরে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে ভদ্রতার সীমা তিনি অতিক্রম করলেন না। এরই মধ্যে আরও দুজন পতঙ্গবিদ মেয়েটির টেবিলে এসে নিজেদের নাম খুঁজে নিলেন। অবশেষে সেক্রেটারি যখন নিস্তার পেল, চেক বিজ্ঞানী তার নামের ফলকটি এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেখুন, মজাটা! আমি যেমনটা বলছিলাম!'

মেয়েটি বুঝতে পারল না ভদ্রলোক ঠিক কী বলতে চান, বলল, 'মঁসিয়ে চেনিপিকি, আমি তো দেখছি আপনার নামের উচ্চারণমতোই আপনার নাম এখানে লেখা!'

'হ্যাঁ। কিন্তু যেটা বলছিলাম। ওই যে একটা ঊর্ধ্বকমার মতো চিহ্ন, স্বরবর্ণের ওপরে বসবে ইংরেজি ভি-এর মতো। সেটা যেখানে দিতে হবে, সেখানে দিতে ঠিকই এরা ভুলে গেছে। দিয়েছে ভুল জায়গায়।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন।' মেয়েটি যেন রেগে গেছে, এই রকমভাবে বলল।

'কেন লোকে সব সময় এটা ভুলে যায়।' চেক বিজ্ঞানী বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—'এই চিহ্নটা এতটাই কাব্যিক, তুমি কি তা মনে করো না? ডানা মেলা পাখির মতো, শান্তির পায়রার মতো।' কণ্ঠস্বরে আরও আদুরে ভঙ্গি ফুটিয়ে তিনি বললেন, 'এই চিহ্নটা প্রজাপতির মতো।'

তিনি আবারও টেবিলে ঝুঁকলেন, কলম তুলে নিলেন হাতে, তার নামফলকের ওপরে কলম চালিয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক চিহ্নটা বসিয়ে নিলেন। এমন বিনয়ের সঙ্গে তিনি তা করলেন যেন তিনি ক্ষমা চাইছেন। তারপর আর কিছু না বলে তিনি ফিরে গেলেন।

সেক্রেটারি মেয়েটি লোকটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। লম্বা একটা লোক, বেঢপ আকার, মেয়েটির মনে মাতৃত্বের স্নেহের প্রাবল্য দেখা দিল। সে দেখতে পেল, একটা চিহ্ন, প্রজাপতির মতো পাখা দাপাচ্ছে, উড়ছে, শেষে তা গিয়ে বসল লোকটার নামফলকের ওপরে।

বিজ্ঞানী যখন তার আসনের দিকে যাচ্ছেন, ফিরে তাকালেন সেক্রেটারির দিকে, দেখতে পেলেন, মেয়েটা স্নেহপূর্ণ হাসি ধরে আছে তার মুখে। উত্তরে তিনিও হাসলেন। তিনি নিজের আসনে যাওয়ার পথে মোট তিন দফা হাসি

BanglaBook.org

উপহার পাঠালেন মেয়েটিকে। এই হাসি বিষাদমাখা, কিন্তু তাতে গর্বও আছে। বিষণ্ন গৌরব : একজন চেক বিজ্ঞানীকে বর্ণনা করার জন্য এই দুটো শব্দই উপযুক্ত।

মিলান কুন্ডেরা নিজে চেক। যখন এই উপন্যাস লেখেন তখন তিনি ফ্রান্সে থাকেন। উপন্যাসটিও ফরাসি ভাষায় লেখা। কিন্তু তার বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট চেকোস্লোভাকিয়া, সমাজতন্ত্রের আমলের প্রাগ। এই জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি, এরপর কুন্ডেরা সমাজতন্ত্র আর চেকোস্লোভাকিয়া নিয়ে কিছু লিখবেন। দেখা যাক! তাতে সোভিয়েত আগ্রাসনের নিন্দা থাকবে। *প্রথম আলো* পত্রিকায় আমি নিয়মিত 'গদ্যকার্টুন' লিখি, তাতে একবার স্টালিনের পুত্র জ্যাকব কেন মারা গিয়েছিল তা নিয়ে আমি কুন্ডেরার বই থেকে একটা অংশ অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। ঘটনা ছিল এ রকম :

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্যাকব ছিলেন মিত্রবাহিনীতে। তিনি টয়লেটে গিয়ে দেখেন, টয়লেট নোংরা। তিনি তার অফিসারকে অভিযোগ করেন, আমি স্টালিনের ছেলে, এই নোংরা টয়লেটে বর্জ্য ত্যাগ করতে পারব না। অফিসার তাকে বলেন, নিজেই পরিষ্কার করে নাও। জ্যাকব সেটা করতে অস্বীকৃতি জানান। অফিসার তাকে শাস্তি দেন। রাগে-দুঃখে জ্যাকব ঝাঁপিয়ে পড়েন কাঁটাতারের বেড়ায়। সেটা ছিল বিদ্যুতায়িত। জ্যাকব মারা যান। লেখক মিলান কুন্ডেরা বলেছেন, জ্যাকব মারা গেছেন গুয়ের জন্য। হি ডায়েড ফর শিট।

কুন্ডেরা বলেন, যে সোভিয়েত সৈন্যরা পূর্ব ইউরোপ দখল করার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছিল, তারাও মারা গিয়েছিল গুয়ের জন্য।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৭

তার নামের বানানে অক্ষরের ওপরে একটা ছোট্ট ভি-এর মতো চিহ্ন দেখতে না পাওয়ায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন। এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু গৌরব তিনি কোত্থেকে পাচ্ছেন?

এটা তার জীবনবৃত্তান্তের একটা অনিবার্য উপাদান। রাশিয়ানরা তাদের দেশে ১৯৬৮ সালে আগ্রাসন চালায়, তার এক বছর পর তাকে পতঙ্গবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি নির্মাণশ্রমিকের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন, এটা চলে ১৯৮৯ সালে রাশিয়ান দখলদারির অবসান না হওয়া পর্যন্ত, প্রায় কুড়িটি বছর। জীবন গিয়েছে তার, কুড়ি কুড়ি বছরের পার।

কিন্তু চাকরি কি একা তার গেছে? আমেরিকায়, ফ্রান্সে, স্পেনে হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারায়নি? তারা সবাই কষ্ট করেছে, কিন্তু এই নিয়ে তাদের তো কোনো গৌরববোধ নেই। তাহলে কেন এই চেক বিজ্ঞানী গৌরবান্বিত? কেন অন্যরা নয়?

কারণ, তিনি তার চাকরি অর্থনৈতিক কারণে হারাননি, হারিয়েছিলেন রাজনৈতিক কারণে।

ভালো কথা! কিন্তু কেন অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কারও জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এলে সেটাকে কম গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কম মহৎ বলে গণ্য করা হবে?

একজন মানুষের বস তাকে দেখতে পারে না বলে সে চাকরি হারিয়েছে, সেটা হলো লজ্জার, আরেকটা মানুষ রাজনৈতিক মতভিন্নতার কারণে চাকরি হারিয়েছে, সেটা কেন ভীষণ কৃতিত্বের ব্যাপার হবে? এর ব্যাখ্যা কী? কেন এমনটা হবে?

কারণ, যখন কেউ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বরখাস্ত হয়, চাকরি হারানোর ব্যাপারে তখন তার ভূমিকা থাকে নিষ্ক্রিয়, তার কোনো একটা সাহসী অবস্থান নেই যাকে আমরা প্রশংসা করতে পারি।

এটা অবশ্যই একটা চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমরা এটার কথা বলছি না। ১৯৬৮ সালে, যখন রাশিয়ানরা এল, একটা ঘৃণ্য শাসন

BanglaBook.org

কায়েম করল, তখন এই চেক বিজ্ঞানী এমন কোনো কাজ করেননি, যা তার সাহসের পরিচয় বহন করেছিল, বরং ঘটেছিল উল্টোটা। তিনি নিজে ব্যস্ত ছিলেন মাছি নিয়ে গবেষণায়। তিনি ছিলেন ইনস্টিটিউটের প্রধান। একদিন এক ডজন কুখ্যাত বিরোধী মতাবলম্বী লোক কোনো সংকেত না দিয়েই তার ঘরে ঢুকে পড়ল। তারা দাবি করল, তাদের একটা রুম চাই, তাতে তারা গোপন বৈঠক করবে মাঝেমধ্যে। তারা নিজেরা এই ঘটনার কতগুলো দর্শকও এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছে। তারা তাকে একটা নৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে ফেলে দিল। এখন যদি তিনি 'হ্যাঁ' বলেন, তাহলে তিনি তার চাকরি হারাতে পারেন, তার তিন সন্তানের বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এই হঠাৎ করে এসে পড়া একদল বিদ্রোহীকে 'না' বলার মতো সাহসও তার ছিল না। এরা এরই মধ্যে তাকে কাপুরুষ বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি 'হ্যাঁ' বললেন, তাতে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণিত হলো যে তার সাহস নেই, পরিস্থিতি বিরূপ হলে তা সামলানোর কোনো যোগ্যতা তার নেই, সুতরাং তার চাকরি গেল, তার সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হলো। সেটা তার সাহসের জন্য হলো না। হলো তার ভীরুতার জন্য। কাপুরুষতার জন্য।

তা-ই যদি হবে, তাহলে এই লোক কেন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছে? কেন?

যতই দিন যেতে লাগল, তিনি যে 'হ্যাঁ' বলেছিলেন, সেটাকে তিনি কোনো ভীরুতার ফসল বলে গণ্য করতে ভুলে যেতে লাগলেন, তার মনে হতে লাগল, ওই ঘৃণ্য শাসনের বিরুদ্ধে এটা ছিল তার সচেতন সাহসিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, তিনি মোটেই চাপে পড়ে 'হ্যাঁ' বলেননি, তিনি সচেতনভাবে 'হ্যাঁ' বলাটাকেই বেছে নিয়েছিলেন। এটা ছিল তার নিজস্ব বিদ্রোহ। এভাবে তিনি ইতিহাসের মঞ্চে নিজেকে স্থাপন করলেন। এ কারণে তিনি গৌরব বোধ করেন।

এটা কি তবে সত্য নয়, যে অগণন মানুষ অগণিত রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে, তারা ইতিহাসের মঞ্চে আরোহণ করে গৌরব বোধ করতে পারে?

আমাকে আমার থিসিস একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। এই

BanglaBook.org

বিজ্ঞানীর গর্বটা এই কারণে যে ইতিহাসের মঞ্চে যখন আলো পড়েছে, ঠিক সেই সঠিক সময়ে তিনি সঠিক কাজটি করতে পেরেছিলেন। এটা যেকোনো একটা সময়ে করলে হতো না। ইতিহাসের আলোকিত মঞ্চকে বলা হয় 'ঐতিহাসিক বিশ্বসংবাদ সংগঠনের মুহূর্ত'। প্লানেটরি হিস্টোরিক নিউজ ইভেন্ট। ১৯৬৮ সালের প্রাগ ছিল ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক আর ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাওয়া, এটা ছিল সব দিক থেকেই যথাযথ 'ঐতিহাসিক বিশ্বসংবাদ সংগঠনের মুহূর্ত' আর আমাদের এই বিজ্ঞানী ইতিহাসের এই চুম্বনের স্পর্শ নিজের ভ্রুতে অনুভব করেন।

কোনো একটা বাণিজ্যিক চুক্তির মুহূর্ত কিংবা শীর্ষ সম্মেলনও ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে আর আলোয় ঝলসিত থাকে, সেখানে যারা উপস্থিত থাকেন, তারা তো গর্ব অনুভব করেন না?

আমি তাড়াতাড়ি করে চূড়ান্ত পার্থক্যটা বলে নিই। এই চেক বিজ্ঞানী বিশ্বের ঐতিহাসিক সংবাদ-মুহূর্তের হঠাৎ করে আসা কোনো স্পর্শে আলোড়িত নন, বরং তাকে মহিমান্বিত করেছে ইতিহাসের গরিমা। গরিমার মহিমা তখনই আসে, যখন মঞ্চে একজন মানুষ যাতনা ভোগ করে, তার পেছনে বন্দুকের গুলির আওয়াজ ফুটতে থাকে, মাথার ওপর দিয়ে উড়তে থাকে মৃত্যুদূত আজরাইল।

তাহলে পুরো ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে এই চেক বিজ্ঞানী গৌরব করছেন কারণ তাকে স্পর্শ করেছিল মহান 'ঐতিহাসিক বিশ্বসংবাদ সংগঠনের মুহূর্তে'র গরিমা। তাই তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন, মনে করেন যে এই কনফারেন্সে উপস্থিত ফরাসি, ডেনিশ, নরওয়েজিয়ানের চেয়ে তিনি আলাদা।

প্রিয় পাঠক, আপনারা যাঁরা মিলান কুন্ডেরার *স্লোনেস* উপন্যাসের এই অনুবাদ পাঠ করছেন, তাঁদের মনে আছে, এই বইটিই অনুবাদ করার পেছনে আমার প্রেরণা ছিল এটা অনুধাবন করা যে উপন্যাস অনেক প্রকার। সেই কথাটিই আমি আপনাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই। দেখুন, আমাদের গল্প কোত্থেকে কোথায় গেছে। আমরা শুরু করেছিলাম, স্ত্রী ভেরাকে নিয়ে এই কাহিনির কথক প্যারিসের বাইরে গাড়ি করে যাচ্ছেন। তারপর সেই প্রসঙ্গ (পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

BanglaBook.org

১৮

টেবিলের এক প্রান্তে বক্তারা বসেছেন। একজনের পর আরেকজন বলছেন। চেক বিজ্ঞানী অন্যদের কথা শুনছেন না। তিনি নিজের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। মাঝেমধ্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখছেন, তার পাঁচ পৃষ্ঠা বক্তৃতা ঠিকঠাক আছে কি না। বক্তৃতাটা খুব ভালো কিছু না, তিনি নিজেও জানেন। ২০ বছর ধরে তিনি বিজ্ঞানচর্চার বাইরে। কুড়ি বছর আগে একজন নবীন গবেষক হিসেবে তিনি মাছির একটা প্রজাতি আবিষ্কার করেছিলেন, Musca Pragensis। সেই সময় তার যে পেপার বেরিয়েছিল, সেসবেরই একটা সারমর্ম তৈরি করে এনেছেন। সভার সভাপতি কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেন, সেসব তার নামের অংশে আছে—এটা তারই নাম নিশ্চয়ই, তিনি আসন থেকে উঠে বক্তাদের সারিতে চলে গেলেন।

কুড়িটা সেকেন্ড লাগল তাঁর উঠে হেঁটে যেতে। এই কুড়ি সেকেন্ডেই তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন। ও খোদা, বিশটা বছর পরে তিনি ফিরে এসেছেন তার শ্রদ্ধাভাজন লোকদের মধ্যে, যারা তাকে শ্রদ্ধা করেন। এসব বিজ্ঞানী, যারা তাকে আত্মীয় বলে মনে করেন, তিনিও যাদের আত্মীয় জ্ঞান করেন। ভাগ্য তাকে এতটা বছর এদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে

আমরা ভুলে যাই। জীবনের গতি আর ধীরতা বিষয়ে কুন্ডেরার লেকচার শুনতে আরম্ভ করি। দুটো উপন্যাস নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। সেসব উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশিত হয়। তা নিয়ে কুন্ডেরার ব্যাখ্যাও আমরা শুনতে থাকি। একঝলকের জন্য সেই আদি নায়ক এবং ভেরা হোটেলের রুমে আসে। তারা টেলিভিশনে আফ্রিকার শিশুদের অনাহারে মৃত্যুর খবর দেখে। এরপর আবার এই বিষয়গুলো নিয়ে নানা আলোচনা আমরা শুনি। বার্কের কথা আমরা একটু শুনেছিলাম। বার্ক গেছেন একটা কীটপতঙ্গবিষয়ক সেমিনারে। সেই সেমিনারে আমরা পেয়ে গেলাম এক চেক বিজ্ঞানীকে। এবার চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত আগ্রাসন কত খারাপ ছিল, সে বিষয়ে কথা শুনছি। আশা করি, এর পরের পরিচ্ছেদে আমরা বার্ককে পাব।

অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল। তিনি টেবিলের প্রান্তে তার জন্য অপেক্ষমাণ খালি চেয়ারটার কাছে পৌঁছালেন, বসলেন না। তিনি তার আবেগের আদেশ পালন করলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সতীর্থদের কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে লাগলেন।

'ক্ষমা করবেন, প্রিয় ভদ্রমহিলা ও প্রিয় মহোদয়গণ। আমি আমার আবেগ ধরে রাখতে পারছি না। ভাবিওনি এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ব। আমি একটু বিস্মিতই বোধ করছি। বিশটা বছর অনুপস্থিত থেকে আমি আবার কথা বলতে পারছি সেই মানুষদের সামনে, যারা আমার মতো একই রকমের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, যারা আমার মতো একই ভালো লাগা দিয়ে উত্তেজিত হন। আমি এমন একটা দেশ থেকে এসেছি, যেখানে একজন মানুষ শুধু তার নিজের মনের কথা প্রকাশ্যে বলেছে বলে তার জীবনের মানে থেকে বঞ্চিত ছিল। একজন বিজ্ঞানীর জন্য জীবনের মানে কী! বিজ্ঞান। আপনারা জানেন, হাজার হাজার মানুষকে, আমার দেশের সব বুদ্ধিজীবীকে ১৯৬৮ সালের সেই বিয়োগান্ত গ্রীষ্মের পর তাদের নিজ নিজ পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। মাত্র ৬ মাস আগে আমি ছিলাম একজন নির্মাণশ্রমিক। না, তাতে কোনো অসম্মান নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে সাধারণ কাজ করা, তাদের কথা জানা, এই সবই সম্মানের। কিন্তু এর ফলে একটা উপলব্ধিও হয়। আমরা যারা বিজ্ঞানকে ভালোবাসি, বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা করি, আমরা আমাদের ভালোবাসার কাজটা করতে পারি, এটা একটা সুযোগ। এমন একটা সুযোগ, বন্ধুগণ, যার কথা আমার সহকর্মী নির্মাণশ্রমিকেরা কোনো দিনও জানতে পারবে না। এটা তো অসম্ভব, হাতুড়ি কিংবা শাবলের প্রতি আপনি কীভাবে ভালোবাসা দেখাবেন? এই সুযোগ থেকে কুড়িটা বছর আমাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আমি আবার ফিরে এসেছি। আমি এটা নিয়ে ঘোরলাগা অবস্থায় আছি। তাই, প্রিয় বন্ধুগণ, এই মুহূর্তটিকে আমি উদ্‌যাপন করতে চাই। যদিও আমি বিষণ্ণও বোধ করছি।'

যখন তিনি তার শেষ বাক্যটি বলছেন, তাঁর চোখ ভিজে উঠল। কথা শেষ হওয়ার আগেই বার্ক দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাততালি দিতে লাগলেন। ক্যামেরা ছিল সেখানে। বার্কের মুখের ছবি ধারণ করা হলো। চেক

BanglaBook.org

বিজ্ঞানীর মুখও ধরা পড়ল ক্যামেরায়। পুরো রুম দাঁড়িয়ে পড়ল, কেউ দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে, কেউ দাঁড়ালেন দ্রুত, কারও মুখে হাসি, কারও মুখ গম্ভীর, তারা এতটাই উপভোগ করছেন যে জানেন না কখন থামতে হবে। চেক বিজ্ঞানী তাদের সামনে দাঁড়ানো, অস্বাভাবিক লম্বা, খুবই বেঢপ লম্বা, তার মুখ থেকে সেই বেঢপ ব্যাপারটা বিকিরিত হচ্ছে, যতই হচ্ছে ততই তিনি আবেগাপ্লুত বোধ করছেন। তার চোখের জল আর চোখের পাতার আড়ালে থাকতে পারছে না, তার নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার মুখ বেয়ে, তার চিবুক বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, তার সহকর্মীদের সামনে, যারা আরও জোরে আরও জোরে হাততালি দিচ্ছেন।

অবশেষে তার এই অভিনন্দন-পর্ব শেষ হয়ে এল। 'ধন্যবাদ, বন্ধুগণ, ধন্যবাদ, আমার হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ।' বলে তিনি তার চেয়ারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এটা তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের মুহূর্ত। একটা কথা না বলেও তিনি নিজেকে সুন্দর এবং মহান ভাবতে পারছেন। তিনি এখন বিখ্যাত। আহা, তার চেয়ার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার এই সময়টা যদি কোনো দিনও শেষ না হতো!

হ্যাঁ। আমরা বার্ককে পেয়েছি। বার্ক হাততালি দিচ্ছেন। তিনি ভালোবাসেন ক্যামেরা। সঠিক সময়ে তিনি ক্যামেরাও পেয়ে গেলেন। আমরা এরপর ১৯তম অনুচ্ছেদে যাব। প্রিয় পাঠক, যদিও আমরা ভেরা আর তার স্বামীকে ভুলে গেছি, ভুলে গেছি যে লোকটা হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, তবু পরের পর্বগুলোয় আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৯

যখন তিনি তার আসনে গিয়ে পৌঁছালেন তখন কক্ষটিকে শাসন করছে নীরবতা। সম্ভবত, আরও ভালো হয়, যদি বলি, নীরবতার কয়েকটা টুকরা শাসন করছে রুমটিকে। চেক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন নীরবতার একটা প্রকার : আবেগজনিত নীরবতা। তিনি উপলব্ধি করলেন না, সোনাটা যেমন একটু একটু করে সুর বদলে ফেলে, ধীরে ধীরে অতি সূক্ষ্মভাবে, তেমনিভাবে এই আবেগজনিত নীরবতা পরিণত হয়েছে অস্বস্তিকর নীরবতায়। প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন, এই দাঁতভাঙা উচ্চারণের নামের মালিক ভদ্রলোক এতটাই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন যে তার পেপার পড়তে ভুলে গেছেন, যে নিবন্ধ থেকে জানা যেতে পারত তার নতুন মাছি আবিষ্কারের কাহিনি। এবং প্রত্যেকে এও বুঝছেন যে তাকে এখন সেটা পড়তে বলাটা ভদ্রতার বরখেলাপ হয়! দীর্ঘক্ষণের একটা দ্বিধাসংকুল বিরতির পর সভাপতি গলা খাঁকারি দিলেন, বললেন, 'মঁসিয়ে চেকোচিপি, আপনাকে ধন্যবাদ।' তিনি বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, বিজ্ঞানী যেন নিজে থেকেই মনে করতে পারেন তার পেপার পড়ার কথা। এবার তিনি বললেন, 'আমাদের পরের বক্তা হলেন' এই পর্যায়ে নীরবতা ভেঙে গেল, শোনা গেল রুমের আরেক প্রান্ত থেকে আসা চাপা হাসি।

চেক বিজ্ঞানী ডুবে আছেন নিজের ভাবনার সমুদ্রে। তিনি কিছুই শুনছেন না। না হাসির শব্দ, না তার সহকর্মীর বক্তৃতা। এই সময় পাশে বসা বেলজিয়ান বিজ্ঞানী তাকে ডাকলেন। তিনি জেগে উঠলেন অতল ধ্যান থেকে। তখনই তার মনে পড়ল, ও প্রভু, আমি আমার প্রবন্ধ পড়তে ভুলে গেছি! তিনি তার পকেটে হাত ঢোকালেন, ওই তো তার পাঁচটি পৃষ্ঠা পকেটে আছে, তার মানে তিনি স্বপ্ন দেখছেন না। তার চিবুক জ্বালা করতে লাগল। নিজেকে মনে হচ্ছে হাস্যকর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, আপত্তিকর কিছু নেই, এর মধ্যে নেতিবাচক কিছু নেই। যে হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা তার জীবনের বিষণ্নতা আরও বাড়িয়ে দিল, মনে হতে লাগল, এ হলো তার নিয়তি। তার ভাগ্যটাই

BanglaBook.org

এমন, দুঃখমাখা। এ কথা ভেবে পুরো পরিস্থিতিটা তার কাছে মনে হতো লাগল মহত্তর, সুন্দরতর।

না। এই চেক বিজ্ঞানীর বিষাদ থেকে গৌরবকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

২০

প্রতিটা সভাতেই কিছু মানুষ থাকে, যারা বক্তৃতা শোনে না, সম্মেলনকক্ষ ছেড়ে চলে যায় পাশের পানীয়ের কক্ষে। ভিনসেন্ট পতঙ্গবিদদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভীষণ ক্লান্ত। চেক বিজ্ঞানীর আজব কথাবার্তা তার ভালো লাগেনি। সে চলে এল পানকক্ষে। বারের পাশে লম্বা টেবিল। তারই মতো সম্মেলন ত্যাগ করে আসা আরও কজন মানুষ সেখানে বসে আছে। ভিনসেন্ট তাদের পাশে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে পাশের এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ পাড়ল। 'আমার এক বান্ধবী আছে, যে চায় আমি তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করি।' পঁতেভিঁ যখন একই কথা বলে, তখন সে একটা জায়গায় বিরতি দেয়, একটা কথার ওপরে জোর দেয়। পঁতেভিঁর মতো করে শব্দ প্রক্ষেপণের চেষ্টা করল ভিনসেন্ট। তাতে বোধ হয় কাজও হলো। সকলে একযোগে হেসে উঠল। ভিনসেন্ট হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। তখন সে বুঝল, তার কথা শুনে কেউ হাসেনি। ঘরের আরেক পাশে দুজন ঝগড়া করছে। গালাগালি করছে। সবাই তাদের কাণ্ড দেখে হাসছে।

এক মিনিট কি দুই মিনিট পরে সে আবার এমনভাবে কথা বলল, যাতে সবার কানে পৌঁছায়, 'আমি একটা গল্পের মধ্যে আছি, বলছিলাম কী,

---

অধ্যায় ১৯ চলে গেল। আমরা চেক বিজ্ঞানীকে নিয়েই পড়ে রইলাম। প্রিয় পাঠক, চলুন অধ্যায় ২০-এ যাই। দেখি, আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

আমার একজন বান্ধবী আছে, সে চায় আমি তার সঙ্গে বুনো হই।' সবাই তার কথা শুনছে। এবার সে আর বিরতি দেওয়ার ভুল করল না। টানা বলে যেতে লাগল, যাতে কেউ তার কথার ফাঁকে অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিতে না পারে, 'কিন্তু আমি তার কথা রাখতে পারি না। আমি তার সঙ্গে কর্কশ হতে পারি না। আমি তো একজন নরমসরম মানুষ।' এরপর সে নিজেই হাসতে লাগল। দেখল, আর কেউই হাসছে না। এবার সে বলে যেতে লাগল, 'একজন তরুণী আসে আমার কাছে, টাইপিস্ট। আমি বলি, ও লেখে।'

'সে কি কম্পিউটার ব্যবহার করে?' একজন দেখা গেল হঠাৎ করে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ'।

'কোন কোম্পানির কম্পিউটার?'

ভিনসেন্ট একটা নির্মাতা কোম্পানির নাম বলল।

লোকটা বলল, তার কম্পিউটার অন্য ব্র্যান্ডের। সে তার নিজের কম্পিউটারের গল্প করতে লাগল। কম্পিউটার কোম্পানিটা ভালো নয়। তাদের সার্ভিস ভালো নয়। লোক ঠকিয়ে খায়।

ভিনসেন্ট লক্ষ করল, সবাই এর কথাই শুনছে। হাসছে। মাঝেমধ্যে হাসির হররা উঠছে।

ভিনসেন্ট তখন মন খারাপ করে ভাবতে লাগল তার পুরোনো একটা ভাবনা। লোকে ভাবে, একজন মানুষের ভাগ্য তার চেহারার ওপরে নির্ভর করে—লোকটা দেখতে ভালো না খারাপ, তার আকার কেমন, মাথায় চুল আছে নাকি নেই। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে একজন মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে তার কণ্ঠস্বরের ওপরে। ভিনসেন্টের নিজের গলা দুর্বল, মনে হয় ধূর্ত। যখন সে কথা বলতে শুরু করে, কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। যখন সে গলা চড়ায়, মনে হয় লোকটা চেঁচাচ্ছে কেন? বিপরীতে পঁতেভিঁর গলা ভারী, তিনি যখন অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন, মৃদুভাবে, তখনো তা শোনায় সুন্দর, শক্তিমান, প্রীতিকর। সবাই তার কথা শোনে।

আহ, বেচারি পঁতেভিঁ। তিনি ভিনসেন্টের সঙ্গে সদলবলে আসতে চেয়েছিলেন এই সম্মেলনে। কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এটাই তার স্বভাব। কাজের চেয়ে কথা বেশি। ভিনসেন্ট আশাহত হয়েছিল। তবে

BanglaBook.org

একটা বিষয়ে সে পঁতেভিঁর ওপরে খুশি। আরও বেশি অনুগত বোধ করছে। তা হলো, ভিনসেন্টের যাত্রার প্রাক্কালে পঁতেভিঁ তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'শোনো, তুমি কিন্তু আমাদের সবার পক্ষ থেকে যাচ্ছ, তুমি আমাদের সবার প্রতিনিধি। যাও। তোমাকে আমি পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছি, আমাদের নামে, আমাদের স্বার্থে তুমি ওখানে যেকোনো কিছু করার অধিকার পাচ্ছ।'

ভিনসেন্ট জানে, এই কথা ছিল একটা কৌতুকমাত্র। কিন্তু বন্ধুদের এই দলের সবাই জানে, এই যে অর্থহীন পৃথিবী, এখানে কেবল কৌতুক করে বলা আদেশই পালন করা উচিত। মাচু হাসছিল। সে পঁতেভিঁর কথায় সায় দিচ্ছিল। এখন এই সেমিনার রুমের পাশের ঘরে বসে ভিনসেন্টের মনে পড়ল সেই হাসিমুখ অনুমোদনের কথা। তাহলে তার এখন একটা কিছু করা উচিত। ঠিক এই সময়ে তার চোখ পড়ল এক তরুণীর ওপর, যাকে সে খুবই পছন্দ করে।

২১

পতঙ্গবিদেরা গাড়ল হয়ে থাকে। এই মেয়েটিকে তারা উপেক্ষা করছে। মেয়েটি তাদের কথা মন দিয়ে শুনছে। যখন তার হাসা উচিত, হাসছে। যখন গম্ভীর হওয়া উচিত, হচ্ছে। নিশ্চিত যে সে এই লোকগুলোকে চেনে না। তার হাসি তার মনের ভেতরের লজ্জাকে ঢাকার একটা উপায়মাত্র। ভিনসেন্ট উঠল, মেয়েটির টেবিলের দিকে গেল। তাদের দলে যোগ দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে লাগল। তারপর তারা দুজনে আলাদা হয়ে গেল। শুরু হলো রাজ্যের যত গল্প। মেয়েটির নাম জুলি। সে ছোট্ট একটা চাকরি করে। পতঙ্গবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানের টাইপিস্ট। বিকেলে তার কোনো কাজ থাকে না। তাই সে এই বিখ্যাত ভবনে এসেছে। পতঙ্গবিদদের দেখবে বলে। এতকাল পর্যন্ত সে কোনো পতঙ্গবিদ দেখেনি। তারা তার কৌতূহলকে উসকে দিচ্ছে। যদিও সে তাদের আড়ালে পড়ে আছে এক ভীত হরিণীর মতো। ভিনসেন্ট মেয়েটির

BanglaBook.org

সঙ্গ উপভোগ করছে। তাকে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে না। বরং সে নিচু গলায় কথা বলছে, যাতে অন্যরা শুনতে না পায়। তারপর সে তাকে আরেকটা টেবিলে নিয়ে যায়। যাতে তারা পাশাপাশি বসতে পারে। সে তার হাত রাখে হাতে।

সে বলে, 'তুমি জানো, সবকিছু নির্ভর করছে কণ্ঠস্বরের শক্তির ওপরে। সুন্দর মুখের চেয়েও তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমার গলা ভারি সুন্দর।'

'তোমার তা মনে হয়?'

'হ্যাঁ। তা-ই মনে হয়।'

'কিন্তু দুর্বল!'

'এটাই তোমার গলার সৌন্দর্য। আমার গলা বাজে, কাকের মতো কর্কশ! তোমার কি তা মনে হয় না?'

ভিনসেন্ট আদুরে গলায় বলে, 'না। আমি তোমার গলার স্বর পছন্দ করি। এটা বেশ উসকানিমূলক। বেশ ভারিক্কিও।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'তোমার গলার স্বর তোমারই মতো।' আদরমাখা গলায় ভিনসেন্ট বলে, 'তুমি নিজে বেশ একজন মানুষ, যে অন্যকে জাগিয়ে তোলে। অন্যের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে।'

জুলির এ কথা পছন্দ হয়। সে বলে, 'আমিও সে রকমই ভাবি।'

ভিনসেন্ট বলে, 'এই লোকগুলো গাড়ল।'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ!'

'লোকদেখানো ভাব। বুর্জোয়া। বার্ককে দেখেছ? একটা গাধা।'

জুলিও তার কথায় সায় দেয়। লোকগুলো এতক্ষণ তাকে একদম পাত্তা দেয়নি। যেন তাকে দেখেইনি। কাজেই এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হবে, সে তাতেই সমর্থন দেবে। প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। ভিনসেন্টকে তার খুব ভালো লেগে যাচ্ছে। দেখতে ভালো। হাসিখুশি। কোনো দেখানেপনা নেই।

ভিনসেন্ট বলে, 'আমার মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা লন্ডভন্ড করে দিই।'

খুব সুন্দর কথা। বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতির মতো শোনাচ্ছে। জুলি হাসে।

BanglaBook.org

তার মনে হচ্ছে সে হাততালি দেয়।

ভিনসেন্ট বলে, 'আমি তোমার জন্য হুইস্কি আনছি।' সে উঠে বারের দিকে যায়।

২২

এরই মধ্যে সভাপতি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অংশগ্রহণকারীরা সম্মেলনকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে কোলাহল তুলে। তারা লবিতে আসে। লবি পরিপূর্ণ মানুষে। বার্ক যান চেক বিজ্ঞানীর কাছে। 'আমি আপনার বক্তৃতা শুনে এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি যে কী বলব!' তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কথা খুঁজতে থাকেন, যেন বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। 'আপনার এই সাক্ষ্য আমরা তো সবকিছু কত সহজে ভুলে যাই। অবশ্য আমি আপনাকে এতটুকুন বলতে পারি যে আমি কিন্তু আপনার দেশে কী হচ্ছিল না হচ্ছিল সে ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল ছিলাম। আপনারা সমস্ত ইউরোপের গর্ব, ইউরোপের তো আসলে গর্ব করার বেশি কিছু নেই।' চেক বিজ্ঞানী এমন একটা ভঙ্গি করেন যেন বলতে চান, আরে না না আপনি বাড়িয়ে বলছেন

'না। আপত্তি করবেন না।' বার্ক বলেন, 'আমি ভেবেচিন্তে এটা বলছি। আপনারা, বিশেষ করে আপনার দেশের বুদ্ধিজীবীরা, কমিউনিস্ট দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যে সাহস দেখিয়েছিলেন, সে সাহস তো আমাদের নেই। আপনারা স্বাধীনতার জন্য কী একটা আকুলতাই না দেখিয়েছিলেন। স্বাধীনতার জন্য আপনারা যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।' এরপর তিনি তার বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে একটু আটপৌরে ভাব গলায় ফুটিয়ে বলেন, 'আর তা ছাড়া বুদাপেস্ট একটা বিশাল শহর, গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি আমাকে বলতে দেন, বুদাপেস্ট হলো ইউরোপীয়।'

'আপনি বোঝাতে চাইছেন প্রাগ?' চেক বিজ্ঞানী বলেন সংকোচের সঙ্গে।

উফ! এই যে ভূগোলের জ্ঞান। এটা বার্কের এত কম! এই ভূগোল

BanglaBook.org

আবারও তাকে একটা ছোট্ট ভুল করাল। তার সামনের লোকটা তো প্যাঁচঘোচ জানে না। তাই তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি বোঝাতে চেয়েছি প্রাগ। আমি আরও বোঝাতে চেয়েছি ক্রাকাও, সোফিয়া, সেন্ট পিটার্সবার্গ। আমার মনের মধ্যে আছে পূর্ব ইউরোপের সব শহর, যারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে জেগে উঠেছে।'

'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বলবেন না। আমরা চাকরি হারিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে কখনো নেয়নি।'

'ও আমার প্রিয় বন্ধু। পূর্ব ইউরোপের সব দেশ তো পুরোটাই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। সত্যিকার বা কিংবা রূপকধর্মী!'

'আর দয়া করে পূর্ব পূর্ব করবেন না। প্রাগ মোটেও পূর্ব না। এটা পশ্চিম। যেমন প্যারিস। ১৪০০ সালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। চার্লস ইউনিভার্সিটি। পুরো রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন জ্যান হাস। লুথারের পূর্বসূরি। চার্চের সংস্কারক। বানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।'

এই লোকরে কি মাছি কামড়াইছে? বার্ক বিরক্ত। যে তাকে সবার সামনে তুলে ধরল, তাকেই কিনা সে জ্ঞান দিচ্ছে? বার্ক রাগ গোপন করে গলায় উষ্ণতা ফুটিয়ে বলে, 'আমার বন্ধু। পূর্ব থেকে এসেছে বলে লজ্জিত হবেন না। ফ্রান্সের হৃদয়ে আছে পূর্বের জন্য উষ্ণতম ভালোবাসা। আপনাদের উনিশ শতকের মাইগ্রেশনের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

'আমাদের কোনো উনিশ শতকের ইমিগ্রেশন নেই।'

'মিকি উইজের কথা স্মরণ করুন। তিনি যে ফ্রান্সকে তার দ্বিতীয় আবাস বানালেন, সে জন্য আমি গর্ববোধ করি।'

'মিকি উইজ তো চেক নন।' চেক বিজ্ঞানী আপত্তি জানাতেই থাকেন।

ঠিক সেই সময়ে ইমাকুলাতা দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। সে তার ক্যামেরাম্যানদের হাত নেড়ে ইশারা দেয় ক্যামেরা ঠিক করতে। তারপর এগিয়ে যায় বার্কের দিকে, তাকে সম্বোধন করে, 'জ্যাক আলেইঁ বার্ক!'

ক্যামেরাম্যান তার কাঁধে ক্যামেরাটা ঠিকমতো বসায়, 'একটা মিনিট!'

ইমাকুলাতা ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকায়, তারপর আবারও বলে, 'জ্যাক আলেইঁ বার্ক!'

BanglaBook.org

২৩

যখন, এক ঘণ্টা আগে, বার্ক ইমাকুলাতাকে দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তার মনে হয়েছিল যে তিনি চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু এখন এই চেক বিজ্ঞানী যে বিরক্তি উৎপাদন করেছেন, তা ইমাকুলাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই মহিলা তাকে চেক বিজ্ঞানীটির জ্ঞানের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে, সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে একপ্রস্থ হাসিও উপহার দিলেন।

খুশি হয়ে ইমাকুলাতা হাসিমুখে, দৃশ্যত, পরিচিত গলায় বলে, 'জ্যাক অ্যালেইঁ বার্ক, এখানে এই পতঙ্গবিদদের সমাবেশে, নিয়তির নির্দেশে, একটু আগে আপনি খুবই আবেগপূর্ণ একটা মুহূর্ত পাড়ি দিলেন

মেয়েটি তার মাইক্রোফোন এগিয়ে দেয় বার্কের মুখের সামনে। বার্ক স্কুলবালকের মতো জবাব দিতে থাকেন, 'আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে এখানে একজন চেক বিজ্ঞানীকে স্বাগত জানানোর, যিনি কিনা তার পতঙ্গবিদের পেশার সাধনা ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়েছিলেন সারাটা জীবন কারাগারে কাটাতে! আমরা সবাই তার উপস্থিতিতে আবেগে আপ্লুত।'

একজন নাচিয়ে হওয়া কেবল একটা আবেগের ব্যাপার নয়, এটা হলো এমন একটা পথ বেছে নেওয়া, যেখান থেকে আর কখনো ফিরে আসা যায় না। দুবিকিউ তাকে হারিয়ে দিয়েছিল এইডস রোগীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের সময়। বার্ক যে সোমালিয়ায় গিয়েছিলেন, তা তো মানুষের কল্যাণ করতে নয়, বরং নাচের একটা ভুল মুদ্রা ঢাকার প্রয়াসে সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন তার মনে হচ্ছে তার মন্তব্য যথেষ্ট সুন্দর হয়নি। কী যেন কম পড়ল! একটুখানি লবণ দরকার। তিনি কথা বলেই চলেন। একটু দূরে দেখতে পান একটা অনুপ্রেরণা হেঁটে আসছে তারই দিকে, তিনি বলে ফেলেন, 'আমি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চাই, আমার প্রস্তাব হলো, আমরা একটা ফরাসি-চেক কীটতত্ত্ববিদ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করব। (হঠাৎ করে আসা এই ভাবনা তার নিজেকেই বিস্মিত করল, এখন তার বেশ ভালো বোধ হচ্ছে)। আমি একটু আগে এই আইডিয়া আমার প্রাগ থেকে আসা সহকর্মীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। (তিনি চেক বিজ্ঞানীর

BanglaBook.org

দিকে ইঙ্গিত করলেন।) তিনি আমার এই আইডিয়াটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, এই অ্যাসোসিয়েশনের নাম হবে মিকি উইজের নামে। মহান নির্বাসিত কবি আদাম মিকি উইজ। আমাদের দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্বের প্রতীক একটি নাম। এই নাম আমাদের সব সময় শিক্ষা দেবে, আমরা যা-ই করি না কেন, বিজ্ঞান কিংবা কবিতা, তা একটা বিদ্রোহের কাজমাত্র। (বিদ্রোহ কথাটা তাকে কথা বলার স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল। গরু নদীতে পড়েছে। এবার নৌকাভ্রমণ নিয়ে বলা যাবে!) বিদ্রোহ! প্রতিটা মানুষ সারাক্ষণই বিদ্রোহের মধ্যে আছে। তা-ই কি নয়, বন্ধু আমার? (তিনি চেক বিজ্ঞানীর দিকে তাকালেন, বিজ্ঞানী মাথা ঝাঁকালেন, যার মানে, হ্যাঁ। অবশ্যই।) আপনি এটা প্রমাণ করেছেন আপনার জীবন দিয়ে। আপনার ত্যাগ দিয়ে। নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে। আপনি আমার এই বিশ্বাসকে জোরদার করেছেন যে মানুষ আসলে নিজেকে যোগ্য করে তোলে সর্বদা বিদ্রোহ করার মধ্য দিয়ে। শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যেদিন শোষণ থাকবে না (তিনি একটা বড় বিরতি নিলেন। পঁতেভিঁই আর একজন মাত্র ব্যক্তি, যিনি এত বড় বিরতি নিতে পারেন সার্থকতার সঙ্গে, তারপর একটু নিচু স্বরে তিনি বলে চলেন) মানুষের যে অবস্থা আমরা বেছে নিইনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।'

'মানুষের যে অবস্থা আমরা বেছে নিইনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!' এটা ছিল তার শেষ বাক্য। এটা তিনি বানিয়ে বললেন। একটা ফুল ফোটালেন। এটা তার নিজেকেই মুগ্ধ করছে। এত সুন্দর একটা লাইন। সত্যিই সুন্দর। রাজনীতিকদের রোজকার ভাষণের চেয়ে কত আলাদা! লাইনটা তাকে এই দেশের সবচেয়ে ভালো চিন্তাবিদদের স্তরে উন্নীত করল। কামু হয়তো এমন কথা লিখতে পারতেন। মার্লে। কিংবা পারতেন সার্ত্রে।

দারুণ। ইমাকুলাতা ইশারা করল। ক্যামেরা বন্ধ হলো।

চেক বিজ্ঞানী এগিয়ে আসেন। বার্ককে বলেন, 'খুব সুন্দর। খুবই সুন্দর। কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়। মিকি উইজ মোটেই চেক ছিলেন না।'

এ ধরনের একটা পাবলিক পারফরম্যান্সের পর, উন্মুক্ত প্রদর্শনী শেষে, বার্ক একজন মাতালের মতো ঘোরগ্রস্ত থাকেন, তার কণ্ঠস্বর থাকে দৃঢ়, বিদ্রূপাত্মক, উঁচু; চেক বিজ্ঞানীকে বাধা দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি জানি,

BanglaBook.org

আমি জানি, যেমন আমি জানি, মিকি উইজ একজন কীটতত্ত্ববিদও ছিলেন না, সাধারণত কোনো কবিই কীটতত্ত্ববিদ হন না, তবু তারা সবাই এই মানবপ্রজাতিরই গর্ব। তেমনি ভাবে আপনারা, কীটতত্ত্ববিদেরা, এমনকি আপনিও, সমস্ত মানবজাতির গৌরব।'

একটা বিশাল হাসির হররা ওঠে। পিচকিরির মতো করে। এতক্ষণ যা চাপা পড়েছিল। এই পতঙ্গবিদেরা হাসার জন্য মারা যাচ্ছিল। কিন্তু হাসতে পারছিল না। চেক বিজ্ঞানী এতটাই আবেগাপ্লুত যে তার পেপার পড়তেই ভুলে গেছেন। এখন বার্কের দুর্বিনীত মন্তব্য তাদের ভদ্রতার লাগাম থেকে মুক্তি দিয়েছে, তারা এখন হাসির হুল্লোড় তুলেছেন মনের আনন্দে।

চেক বিজ্ঞানী দুর্ভাবনায় পড়েন। দশ মিনিট আগে যারা তাকে কত শ্রদ্ধাই না দেখালেন, তারা এখন এভাবে হাসছেন কেন? এটা কী করে সম্ভব যে তারা হাসতে পারছেন? নিজেদের অনুমতি দিচ্ছেন হাসার জন্য? মানুষ এত তাড়াতাড়ি করে শ্রদ্ধা থেকে সরে গিয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে? (হ্যাঁ। পারে। বন্ধুরা, পারে)। তাহলে কি শুভবোধ এতটাই ভঙ্গুর, এতটাই নাজুক? (হ্যাঁ। বন্ধুরা। তা-ই সত্য)

এই সময় এগিয়ে আসে ইমাকুলাতা। বার্ককে সে সজোরে আর মাদকতাময় কণ্ঠে বলে, 'বার্ক। বার্ক। অপূর্ব। চমৎকার। উফ্। এত সুন্দর করে কেবল তুমিই বলতে পারো। তোমার এই পরিহাসকে আমি পছন্দ করি। তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপরেও এটাই প্রয়োগ করেছিলে! স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তোমার! বার্ক। বার্ক। তুমি আমার নাম দিয়েছিল ইমাকুলাতা, যার মানে দাগহীন। রাতের পাখি তোমার ঘুম নষ্ট করত। তোমার স্বপ্নকে চৌচির করত। আমরা দুজনে মিলে একটা ফিল্ম বানাব। তোমার ওপরে একটা ছবি। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এমন একটা সিনেমা বানানোর অধিকার কেবল আমারই আছে।'

চেক বিজ্ঞানীকে তিনি যেভাবে ধরাশায়ী করেছেন, তার ফলে কীটতত্ত্ববিদেরা যে হাসি দিয়েছে, তার প্রতিধ্বনি এখনো রয়ে গেছে বার্কের মস্তিষ্কে। তাকে দূষিত করে রেখেছে সেই তাজা অনুভূতি। আত্মতৃপ্তি। এসব মুহূর্তে তিনি এমন খোলামেলা আচরণ করে বসেন, যাকে তিনি নিজেই অনেক সময় ভয় পান। তাই এরপর তিনি যা করবেন, তাকে আমাদের

BanglaBook.org

আগাম ক্ষমা করে রাখতে হবে। তিনি ইমাকুলাতার ডানা ধরে তাকে এক পাশে নিয়ে গেলেন, তারপর অন্যদের কানের আড়ালে নিয়ে গিয়ে মেয়েটির ফুটোওয়ালা কানে বলতে লাগলেন, 'যাও। গো ফাক ইয়োরসেলফ। বুড়ি বেশ্যা। তোমার অসুস্থ পড়শি। গো ফাক ইয়োরসেলফ। রাতের পাখি। রাতের কাক। দুঃস্বপ্ন। আমাকে আমার বোকামো মনে করিয়ে দাও? আমার গাধামোর মিনার দেখাও? আমার স্মৃতির নর্দমা বয়ে আনো? আমার তারুণ্যের গন্ধ নিয়ে আসো।'

ইমাকুলাতা শোনে। বিশ্বাস করতে পারে না সে যা শুনছে তা সে শুনছে কি না। সে ভাবে, এই লোক এসব বলছেন কাউকে শুনিয়ে শুনিয়ে কারও কাছে কিছু একটা আড়াল করার জন্য। নিজের অতীতকে ঢাকার জন্য। কাউকে তিনি বোকা বানাতে চাইছেন। আসলে তিনি এসব তাকে বলছেন না, তৃতীয় কাউকে বলছেন শুধু একটা কৌশল হিসেবে।

সুতরাং কোনো রকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নরম কণ্ঠে সে শুধায়, 'তুমি কেন এসব আমাকে বলছ। কেন? আমি এসব কীভাবে নেব?'

'তুমি এসব নেবে একেবারে এ কথাগুলোর যা মানে আছে তা সমেত। আক্ষরিকভাবে। পুরোই আক্ষরিক অর্থে। বেশ্যা মানে বেশ্যা। গুহ্যদ্বারে ব্যথা মানে গুহ্যদ্বারে ব্যথা। দুঃস্বপ্ন মানে দুঃস্বপ্ন। ভাগো মানে ভাগো।'

BanglaBook.org

২৪

ভিনসেন্ট লবির বার থেকে সারাক্ষণই চোখ রাখছে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটে তার থেকে দশ মিটার দূরে। সে কোনো কথা শুনতে পায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার ভিনসেন্ট বুঝতে পারে, পঁতেভিঁর

অধ্যায় ২৩ শেষ হলো। কুন্ডেরার বিরুদ্ধে পুরুষবাদিতার অভিযোগ এখানে হাতেনাতে প্রমাণিত।

পর্যবেক্ষণ একদম ঠিক, বার্ক আসলে একজন প্রচারাকাঙ্ক্ষী ভাঁড়, যার মধ্যে লোকদেখানো ব্যাপারটাই প্রবল। সে একজন নাচিয়ে। সে এসেছে বলেই টেলিভিশন ক্যামেরা এসেছে, কীটতত্ত্ববিদদের বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ভিনসেন্ট তাকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, দেখে তার নৃত্যকলা, কীভাবে সে সারাক্ষণ নিজেকে ধরে রাখছে ক্যামেরার সামনে; দেখে অন্যের সামনে তার নিজেকে তুলে ধরার দক্ষতা, অন্যের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য তার হাত নাড়ার চমৎকার ভঙ্গি! যখন বার্ক ইমাকুলাতাকে ডানা ধরে আড়ালে নিয়ে যায়, তখন ভিনসেন্ট না বলে পারে না, 'এই লোকটাকে দেখো। একটামাত্র জিনিসকেই সে পাত্তা দেয়, টেলিভিশন থেকে আসা মেয়ে মানুষ। সে তো তার বিদেশি সহকর্মীর হাত ধরল না। সে তার সহকর্মীদের পাত্তা দেয় না, বিদেশিদের দিকেই তার খেয়াল নেই, একটামাত্র প্রভু আছে তার, একটামাত্র দয়িতা আছে তার, আছে একজন মাত্র রক্ষিতা, আর তা হলো টেলিভিশন। কারণ, তার আর কোনো মেয়ে মানুষ নাই, কারণ সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অণ্ডহীন মানুষ।'

ভিনসেন্টের কণ্ঠস্বর দুর্বল। কিন্তু এই একমাত্রবার তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এ রকম তো হয়, এমন পরিস্থিতি আসে, যখন ক্ষীণতম কণ্ঠও শ্রুত হতে পারে। এটা ঘটে তখন, যখন আমাদের ভেতরে ভাবনা চুলকানির সৃষ্টি করে, প্রকাশের পথ খোঁজে। ভিনসেন্ট তার ভাবনাগুলোকে আকার দেয়। সে রসিক, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে। সে বলে চলে নাচিয়েদের সম্পর্কে। দেবদূতের সঙ্গে নাচিয়েদের চুক্তি বিষয়ে। নিজের কথার তোড়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে সে তার বাগাড়ম্বরকে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে নিয়ে যায় স্বর্গের দরজায়। একজন যুবক, চোখে চশমা, পরনে থ্রিপিস, ভিনসেন্টের কথা মন দিয়ে শুনছিল। শিকারি যেমন ওত পেতে থাকে তেমনিভাবে। যখন ভিনসেন্ট তার কথামালা সাঙ্গ করল, যুবকটি মুখ খুলল :

'প্রিয় মহোদয়, আমরা কোন যুগে জন্মাব, তা তো আমরা নিজেরা বাছাই করে নিই না। আমরা সবাই ক্যামেরার চোখের নিচে বসবাস করি। এখন থেকে মানুষ হিসেবে জন্ম নিলে এই অবস্থা মানতে হবে। আপনি যখন যুদ্ধ করবেন, তখনো তা করবেন ক্যামেরার সামনে। যখন আমরা কোনো প্রতিবাদ করব, তখন তা যদি ক্যামেরার সামনে না করি,

BanglaBook.org

তাহলে আমাদের কথা কোথাও পৌঁছাবে না। আমরা সবাই নাচিয়ে। যেমনটা আপনি বলছেন। হয় আমরা নাচিয়ে, না হলে আমরা পলাতক। আপনি দেখছি আমাদের জামানা নিয়ে বেশ আফসোস করছেন। তাহলে আপনি চলুন পেছনের দিকে। দ্বাদশ শতাব্দী কি আপনার পছন্দ? তাহলে সে সময়ে চলে যান। যখন আপনি ওই শতাব্দীতে যাবেন, তখন আবার আপনি প্রতিবাদ করবেন ক্যাথেড্রাল নিয়ে। বলবেন, এসব হলো আধুনিক বর্বরতা। আরও পেছনে যেতে চান? বনমানুষদের জামানায় চলে যান, যেখানে কোনো আধুনিকতা আপনাকে হুমকি দেবে না। আপনি আরামে থাকবেন হনুমানদের নিষ্কলঙ্ক স্বর্গে।'

একটা উপযুক্ত আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব না দিতে পারার মতো অপমানজনক আর কিছুই হতে পারে না। অবর্ণনীয় বিব্রতকর গা-জ্বালানো হাসিঠাট্টার ভেতর দিয়ে ভিনসেন্ট অসহায়ভাবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। মিনিটের অস্বস্তি পেরিয়ে গেলে তার মনে পড়ে যে জুলি তার জন্য অপেক্ষা করছে, সে দু গ্লাস হুইস্কি ঢালে, একটা নিজের জন্য, একটা জুলির জন্য।

তার বুকে শেলের মতো বিঁধে আছে থ্রিপিস পরা লোকটার ছবি। কিছুতেই সে তারে পারে না এড়াতে। এটা আরও বেশি বেদনার হয়ে উঠছে, কারণ, যখন সে একটা নারীকে পটিয়ে ফেলবে বলে আশা করছে, তখনই এই ঘটনাটা ঘটল। মনে যদি একটা শেল বিঁধে থাকে, কী করে সে একজন নারীকে পটিয়ে ফেলবে?

মেয়েটি তার মেজাজের বদলটা খেয়াল করে। 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমি তো ভাবলাম তুমি আর আসবেই না! তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছ!'

সে উপলব্ধি করে, মেয়েটা তাকে গুরুত্ব দেয়। এটা তাকে বুকে-বেঁধা তিরের যন্ত্রণা থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। সে আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটির সন্দেহ যায় না। সে বলে, 'আমাকে বানিয়ে গল্প বোলো না। তুমি এখন আর আগের মতো নেই। এর মধ্যে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের দেখা হয়েছে।'

'না। একদমই না।' ভিনসেন্ট বলে।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। একদমই হ্যাঁ। তুমি একজন মেয়ে মানুষের দেখা পেয়েছ। দয়া করে তুমি তার সাথেই যাও। আমার সাথে তোমার থাকা লাগবে না। আধা ঘণ্টা আগেও আমি তোমাকে চিনতাম না। এখনো তা-ই ভাবব। আমি তোমাকে চিনি না।'

মেয়েটিকে দুঃখী থেকে দুঃখীতর দেখায়। আর একজন পুরুষের জন্য কোনো মেয়ের দুঃখের কারণ হওয়ার চেয়ে উপশমকারী মলম দ্বিতীয়টি আর নেই!

'সত্যিই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। একটা বিরক্তিকর, গাড়ল, খবিশের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে একটা তর্কমতো হয়েছে। এ-ই যা! আর কিছু না!' সে জুলির চিবুকে আদর বোলায়, আর মেয়েটি তার সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে।

'তারপরও, ভিনসেন্ট, তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেছ।'

'আমার সঙ্গে চলো।' ভিনসেন্ট বলে। তাকে বারে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। সে চায় তার বুকের শেল হুইস্কির বন্যায় ভেসে যাক। থ্রিপিস পরা অভিজাত লোকটা তখনো রয়ে গেছে ওই বারে। অন্যদের সঙ্গে গল্প করছে। যত দূর চোখ পড়ে আর কোনো নারীকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না। তাতে সে খুশি। সে আছে জুলির সঙ্গে, মেয়েটিকে এ মুহূর্তে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। দুই গ্লাস হুইস্কি নেয় সে, একটা বাড়িয়ে দেয় জুলির দিকে। আরেকটা নিজে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। তারপর জুলির দিকে হেলে পড়ে বলে, 'ওই যে দেখছ, স্যুট পরা, চোখে চশমা, ওই গবেটটা!'

'ওই লোক। ও তো কিছুই না। একেবারেই কিছুই না। এটা কী করে সম্ভব যে তুমি এই রকম একটা ফালতুকে পাত্তা দিচ্ছ?'

'তুমি ঠিক বলেছ! ও হলো একটা খবিশ। ও একটা ক্লীব। ওর কোনো অণ্ড নেই', ভিনসেন্ট বলে। তার মনে হয়, জুলির উপস্থিতি তাকে রক্ষা করেছে পরাজয় থেকে, কারণ একটা জিনিসই কেবল হিসাবে রাখার মতো, তা হলো এই বিষণ্ন নিরুত্তেজক পতঙ্গবিদদের সমাবেশে একজন নারীকে জিতে নেওয়া।

'ও কিছু না। কিছুই না। কিছুই না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি।' জুলি আবারও বলে।

BanglaBook.org

'তুমি ঠিক বলেছ।' ভিনসেন্ট বলে। 'আমি যদি ওর কথা ভাবতেই থাকি, আমি ওর মতো গবেটে পরিণত হব।' সেখানে, সবার সামনে, এই বারে, ভিনসেন্ট জুলির মুখে চুমু খায়।

এটা তাদের প্রথম চুম্বন।

তারা বেরিয়ে যায় পার্কে। ঘোরে। থামে। আবারও চুমু খায়। একটা বেঞ্চ দেখা যায় লনের ধারে। তারা বসে। নদীর কল্লোলধ্বনি ভেসে আসে দূর থেকে। তারা বাহিত হয়। কী দিয়ে তারা জানে না। আমি জানি। তাদের কানে আসছে মাদাম দে টির নদীর কুলকুল ধ্বনি। ভালোবাসার রাতের নদীটির। অতীতের ঝরনা থেকে ভালোবাসার যুগের অভিবাদনবার্তা আসছে ভিনসেন্টের কাছে।

ভিনসেন্ট যেন দেখতে পাচ্ছে। সে বলে, তুমি কি জানো এই প্রাসাদে তারা অর্জি আয়োজন করত। বন্য মদের পার্টি, যেখানে বেপরোয়া সেক্স হতো। আঠারো শতকে। তুমি জানো! সাদ, মার্কি দে সাদ। লা ফিলোসফি দ্যাঁ লে বুদুয়া। তুমি ওই বইটা সম্পর্কে জানো?'

'না।'

'তোমার অবশ্যই বইটা পড়া উচিত। আমি তোমাকে পড়তে দেব। এটা দুজন পুরুষ আর দুজন নারীর কথোপকথন। তখন তারা অর্জির মাঝখানে ছিল।'

'আচ্ছা।' জুলি বলে।

'তারা চারজনই নগ্ন। তারা সঙ্গমরত। চারজন মিলে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার পছন্দ হবে। ঠিক কি না?'

'জানি না।' জুলি বলে। এটার মানে এই নয় যে সে প্রত্যাখ্যান করল। বরং এটা তার বিনয়। ভদ্রতার সুন্দর প্রকাশ।

একটা বুলেট কি বুক থেকে সহজেই বের হয়ে যায়?

BanglaBook.org

২৬

ভেরা ঘুমোচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি জানালায়। দেখতে পাচ্ছি দুজন মানুষ চাঁদের আলোয় প্রাসাদ-হোটেলের বাগানে হাঁটছে।

হঠাৎ করে আমি শুনি, ভেরা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। আমি ঘুরে তার বিছানার দিকে তাকাই। আমার মনে হয়, আরেকটু হলেই সে চিৎকার করে উঠবে। আমি কখনো দেখিনি যে ভেরার ঘুমে হানা দেয় দুঃস্বপ্ন! নিশ্চয়ই এই প্রাসাদের কোনো সমস্যা আছে!

আমি তাকে জাগিয়ে তুলি। সে বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকায়। তার চোখে ভয়। সে এলোমেলো গলায় বলে, 'স্বপ্নে দেখলাম, আমি এই হোটেলের একটা লম্বা করিডরে। আমার দিকে একটা লোক দৌড়ে আসছে। আমার দশ মিটারের মধ্যে চলে আসে সে। চিৎকার করতে থাকে। চিন্তা করো, সে কথা বলে ওঠে চেক ভাষায়। সে বলে, 'মিকি উইজ চেক নয়। মিকি উইজ পোলিশ।' সে আমার আরও কাছে আসে। আমাকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। তখনই তুমি আমাকে জাগিয়ে তুলেছ।'

'আমাকে ক্ষমা করো। তুমি আমার পাগলামোভরা কল্পনার শিকার হয়েছ।'

'তার মানে কী?'

'তুমি যেন সেই ময়লা কাগজের ঝুড়ি, যেখানে আমার লেখার বাতিল পাতাগুলো ছুড়ে ফেলি।'

'তুমি কী বানাচ্ছ? উপন্যাস?' সে ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে জিগ্যেস করে।

আমি মাথা নত করি।

'তুমি আমাকে অনেকবার বলেছ তুমি একটা উপন্যাস লিখতে চাও, যাতে তুমি একটাও গুরুগম্ভীর শব্দ লিখবে না। একটা বড় ননসেন্স লেখা, যা তুমি লিখবে তোমার নিজের আনন্দের জন্য। আমার ভয় হচ্ছে, সেই সময়টা এসে গেছে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, খুব সতর্ক থাকবে।'

আমার মাথা আমি আরও বেশি নত করি।

BanglaBook.org

'তোমার কি মনে আছে তোমার মা তোমাকে কী বলতেন? আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, যেন মাত্র গতকাল তিনি এটা বলছেন, "মিলানকু, ঠাট্টা কোরো না। তোমার রসিকতা কেউ বোঝে না। তুমি সবাইকে আহত করবে। এবং শেষে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে।" তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ। মনে আছে?'

'আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। গাম্ভীর্য তোমাকে রক্ষা করে আসছে। তুমি যদি গাম্ভীর্য কমিয়ে দাও, তা তোমাকে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে। তুমি জানো, তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। নেকড়েরা।'

এই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করে ভেরা আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রিয় পাঠক। আমার স্ত্রী ও কন্যা প্রায়ই আমাকে এই কথা বলে। তারা বলে, তুমি যেসব রসিকতা করো, মানুষ তা ধরতে পারে না। রসিকতা কোরো না।

যা-ই হোক, ভেরা তার স্বামীর উদ্দেশে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে এবং মিলান কুন্ডেরার মা ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, এটা আমি আমার জন্যও শিরোধার্য মনে করছি। আমার খুবই সিরিয়াস থাকা উচিত। কারণ, হালকা কিছু লিখলে ক্ষুধার্ত নেকড়েরা আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমি তাই *স্লোনেস* উপন্যাসের অনুবাদ অনলাইনে দেওয়া এখানেই শেষ করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম আমি পুরোটাই অনুবাদ করব এবং বই হিসেবে প্রকাশ করব।

এই বইয়ের বাকি গল্প সবার জন্য না। এটা কেবল পরিণতদের জন্য এবং সাহিত্যের পাঠকদের জন্য। উপন্যাস নানা রকমের, এটা উপলব্ধি করার জন্য আমি এই উপন্যাস অনুবাদ করছি। আমার ধারণা, সে উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে চরিতার্থ হয়েছে। আপনারা বুঝে গেছেন, কেন্দ্রীয় চরিত্র না থাকলেও এবং ঘনবদ্ধ প্লট না থাকলেও উপন্যাস হয়। অথবা আমরা ক্রিটিক্যালি দেখব। বলব যে, মি. কুন্ডেরা, আপনার এই বইটাকে উপন্যাস হিসেবে আমরা পছন্দ করছি না। মন খোলা রেখে আমাদের এই উপন্যাসটি পড়ে যেতে হবে। পড়তে পড়তে আমরা ভাবব, নিজের সঙ্গে তর্ক করব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৭

দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, মনের মধ্যে ক্ষত নিয়ে চেক বিজ্ঞানী তার রুমে ফিরে আসেন। তার কানে এখনো বাজছে বার্কের ইয়ার্কির পর মানুষের হাসির হররা। এখনো তার মনে হচ্ছে মানুষ কি আসলে এত সহজে বন্দনা থেকে অবমাননায় চলে যেতে পারে?

আর আমার মনে প্রশ্ন জাগে, মহিমান্বিত ঐতিহাসিক বিশ্বসংবাদ সংঘটন মুহূর্তের চুম্বন থেকে আসলে কী উদ্ভূত হলো?

এইখানেই সংবাদ সংঘটনের কুশীলবেরা ভুলটা করে থাকে। তারা জানে না, ইতিহাস মঞ্চের ওপরে আলো ফেলে শুধু প্রথম কয়েক মিনিট। কোনো ঘটনাই পুরোটা সময় খবর হিসেবে গণ্য হয় না। এর খবরমূল্য থাকে খুব অল্পক্ষণজুড়ে, সম্ভবত প্রথম পর্যায়ের কিছু সময়ে। সোমালিয়ার মরণাপন্ন শিশুরা কি এখন মারা যাচ্ছে না, যাদের খবর মানুষ সারাক্ষণ হাঁ করে দেখত! তারপর তাদের কী হলো? তারা কি এখন মোটা হয়ে গেছে, নাকি আরো শুকিয়ে গেছে? সোমালিয়া কি এখনো আছে? কিংবা সত্যিকারের প্রশ্ন হলো, সোমালিয়া কি আসলেই কখনো ছিল? এটা কি কেবলই একটা মরীচিকা?

সাম্প্রতিক ইতিহাস কীভাবে বিবৃত হয়? মনে হয়, বিটোফেনের ১৩৮টি ওপাস (opuses) একটার পর একটা পরিবেশিত হলো। কিন্তু প্রতিটার শুধু প্রথম আটটা বারই (bar) তারা বাজাবে। ১০ বছর পরে আবার যখন একই কনসার্ট হবে, তখন প্রতিটি অংশ থেকে শুধু প্রথম নোটটা বাজিয়ে দেবে। পুরো কনসার্টে ১৩৮টি নোটের একটা অখণ্ড সুর বাজানো হবে। বিশ বছর পরে পুরো বিটোফোনের সমগ্র সৃষ্টিকে বানিয়ে ফেলা হবে একটা লম্বা একক গুনগুন ধ্বনি। যেন বধির বিটোফেন তার বধিরত্বের প্রথম দিনে কানের মধ্যে একটা একটানা গুঞ্জন শুনছেন।

চেক বিজ্ঞানী বিষাদগ্রস্ত। সান্ত্বনা হিসেবে একটা ভাবনা এল তার মাথায়। তার নির্মাণশ্রমিকের দিনগুলো থেকে তিনি একটা জিনিস স্মারক হিসেবে নিয়ে এসেছেন। তার পেটানো শরীর। সবাই সেটা ভুলতে চায়। তিনি ধরে

BanglaBook.org

রাখেন। কথাটা মনে হতেই তার মুখে একটা হাসির ঝিলিক খেলে যায়। একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, এখানে আর কারোরই তার মতো পেশি নেই।

হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন। এই আপাত হাস্যকর ভাবনাটাই তার উপকার করে। তিনি তার জ্যাকেট ছুড়ে মারেন। মেঝেতে উপুড় হয়ে শোন। হাতের ওপরে ভর দিয়ে বুকডন দিতে থাকেন। ২৬ বার বুকডন দেন। নিজেকে নিয়ে এইবার তিনি গর্বিত। তার মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা, কাজ সেরে তিনি আর তার সহকর্মীরা নির্মাণ এলাকার পেছনে একটা ছোট্ট পুকুরে নেমে পড়তেন। সাঁতার কাটতেন। সত্যি কথা বলতে কি, আজ তিনি এই হোটেলে যেমনটা আছেন, তার চেয়ে ওই শ্রমিকের দিনগুলোতে অনেক বেশি সুখী ছিলেন। শ্রমিকেরা তাকে ডাকত আইনস্টাইন বলে। তারা তাকে পছন্দ করত।

তার মনে একটা ফালতু ভাবনা এল। তিনি জানেন ফালতু কথাটার মানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খুশি। তিনি এখন যাবেন হোটেলের অভিজাত সুইমিংপুলে। খুশিমনে, সচেতন হামবড়া ভাব নিয়ে, সুরুচিসম্পন্ন, এই দেশের অতিসভ্য কিন্তু অবিশ্বস্ত দুর্বল রোগা বুদ্ধিজীবীদের দেখাবেন তার শরীরের পেশল সম্পদ। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তার স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে, এগুলো তিনি সব সময় সর্বত্র নিয়ে যান। তিনি সাঁতারের পোশাক পরেন। নিজের অর্ধনগ্ন শরীরটাকে দেখে নেন আয়নায়। তিনি হাত ভাঁজ করেন, পেশি ফুলে ওঠে দারুণভাবে। 'কেউ যদি আমার অতীতকে অস্বীকার করতে চায়, এই হলো তার অকাট্য প্রমাণ।' তিনি কল্পনা করেন, প্যারেড করছেন সুইমিংপুলের চারপাশ দিয়ে, ফরাসিদের দেখাচ্ছেন, দ্যাখো, পৃথিবীতে আজও আছে এক মৌলিক মূল্যবোধ, যার নাম নিখুঁত শারীরিক সৌকর্য, যার দর্প কেবল তিনিই দেখাতে পারেন, আর কেউ যার কোনো ধারণাই রাখে না। এখন এভাবে প্রায় ন্যাংটো হয়ে হোটেল লবি দিয়ে হাঁটা ঠিক হবে না। তিনি শরীরের ওপরের অংশে একটা গেঞ্জিমতো চাপান। কিন্তু পা দুটোর কী হবে? এগুলো কি নগ্নই থাকবে? সেটাও ঠিক হবে না। আবার জুতা পরাও ঠিক হবে বলে মনে হয় না। তিনি এক জোড়া মোজা পরেন। এই পোশাকে তিনি নিজেকে দেখে নেন আয়নায়। আবারও তার মন খারাপ ভাবটা উবে যায় গর্বের উত্তাপে। নিজেকে নিয়ে আর কোনো ভাবনা নেই তার।

BanglaBook.org

২৮

গুহ্যদ্বার। অ্যাসহোল। এই কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গিয়ম অ্যাপোলিনের বলেছিলেন তোমার শরীরের নবম দ্বার। নারীর শরীরের ৯টি দ্বার নিয়ে তার লেখা কবিতার দুটো সংস্করণ আছে : প্রথমটা ১৯১৫ সালের ১১ মে তার বান্ধবী লৌয়ের কাছে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন ট্রেঞ্চে বসে, আরেকটা সংস্করণ তিনি পাঠিয়েছিলেন তার আরেক বান্ধবী, ম্যাদেলিঁকে, একই বছরের ২১ সেপ্টেম্বরে। দুটো কবিতাই খুব সুন্দর। দুটো আলাদা। চিত্রকল্প আলাদা। কিন্তু গড়ন একই। প্রতিটা স্তবকে নারীর একেকটা দরজার কথা। একটা স্তবকে একটা চোখ, আরেকটা স্তবকে আরেকটা চোখ। ডান নাসারন্ধ্র, বাম নাসারন্ধ্র। মুখগহ্বরের জন্য একটা। লৌকে লেখা চিঠিতে তিনি এরপর লিখলেন 'পুচ্ছদেশের দরজা' নিয়ে। আর নবম দ্বার হলো নাভিমূল। কিন্তু ম্যাদেলিঁকে লেখা কবিতায় তিনি নাভিমূলকে আনলেন অষ্টমে, আর গুহ্যদ্বারকে আনলেন নবম দরজার জায়গায়, 'দুই মুক্তাখচিত পাহাড়ের মধ্যে যে খাড়ি।' 'এই দ্বার অন্যগুলোর চেয়ে বেশি রহস্যময়।' 'এই জাদুকরি ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বার।' সুপ্রিম।

আমি কবি গিয়ম অ্যাপোলিনেরের এই দুটো কবিতা লেখার মাঝখানের ৪ মাস ১০ দিন নিয়ে ভাবি। তিনি ট্রেঞ্চের মধ্যে। গভীরভাবে ভাবছেন।

কামুকতাভরা দিবাস্বপ্ন তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিল, তিনি মত বদলালেন, শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, গুহ্যদ্বার হলো নগ্নতার আণবিক শক্তির অলৌকিকতাময় মূলকেন্দ্র। নাভিমূল খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই। অতি অবশ্যই। কে অস্বীকার করবে? কিন্তু অতিবেশি অফিশিয়ালি গুরুত্ব এটার। এটা একটা রেজিস্ট্রিকৃত এলাকা। শ্রেণিভুক্ত। নথিভুক্ত। ব্যাখ্যাকৃত। পরীক্ষিত। নিরীক্ষিত। অতিদৃষ্ট। নন্দিত। বন্দিত। নাভিমূল মুখরিত মানবসভ্যতা বারবার করে মিলিত হয়েছে রাস্তার যে মোড়টাতে। একটা সুড়ঙ্গ, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সার বেঁধে চলে গেছে। অতি সরলেরাই কেবল এই জায়গার গোপনতার কথা বিশ্বাস করে। এটা হলো সবচেয়ে প্রকাশ্য স্থান।

BanglaBook.org

একটাই জায়গা আছে যা আসলে গোপন। যার নিষিদ্ধতাকে পর্নোগ্রাফিক সিনেমাগুলোও শ্রদ্ধা করে। তা হলো নিতম্বের মধ্যের এই সুড়ঙ্গ। শ্রেষ্ঠ দ্বার। সুপ্রিম। সুপ্রিম, কারণ এটা সবচেয়ে গোপন আর সবচেয়ে পবিত্র।

এই প্রজ্ঞা, কবি অ্যাপোলিনের এটা অর্জন করতে নিয়েছেন চারটা মাস, তাকে থাকতে হয়েছে ট্রেঞ্চে, মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে কামানের গোলা। আর ভিনসেন্ট এই জ্ঞান অর্জন করে ফেলল জুলির সঙ্গে একটুখানি হেঁটেই। বোধ হয় চাঁদের আলো তাকে স্বচ্ছতা দিয়েছে।

আমি জানি না মূল ফরাসিতে কুন্ডেরা কোন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমারটা তো অনুবাদের অনুবাদ। ইংরেজিতে কথায় ব্যবহার নানা রকমের স্ল্যাং কথায় করা হয়। ওরা তো এফ... ছাড়া কোনো কথা শেষই করতে পারে না। আমাদের মুখে এটা আসে না। লেখায় তো আরো কঠিন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অবশ্য তাঁর সংলাপে অবলীলায় ঢাকার কুট্টিদের নানা গালিগালাজ, যা তাদের কাছে নিত্য-উচ্চার্য, এসব লিখতেন। ইংরেজিতে *স্লোনেস* বইয়ে পাচ্ছি 'অ্যাস হোল'। মুশকিল। এই মুশকিল নিয়েই বর্ণনা আছে পরের অধ্যায়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৯

তুমি যা বলছ, আর যা বলতে চাইছ, তা বলতে পারছ না, এই দুটোর মধ্যে যখন পার্থক্য ঘটে, তখন খুবই মুশকিল হয়। অনুচ্চারিত 'গুহ্যদ্বার' শব্দটি ভিনসেন্টের মুখে এক টুকরো কাপড়ের মতো আটকে রইল। সে আকাশের দিকে তাকায়, যেন স্বর্গ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। স্বর্গ তার জন্য সাহায্য মঞ্জুর করে। তার কাছে আসে কাব্যিক প্রেরণা। ভিনসেন্ট আকাশের চাঁদের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'তাকাও। এটা যেন আকাশের গুহ্যদ্বার।'

সে তাকায় জুলির দিকে। জুলিকে দেখাচ্ছে স্বচ্ছ, নরম। সে হাসে। বলে, 'হ্যাঁ।' এক ঘণ্টা ধরে ভিনসেন্ট যা-ই বলে, জুলি তার প্রশংসাই করে আসছে।

ভিনসেন্ট তার 'হ্যাঁ' শুনেছে। কিন্তু সে আরো শুনতে চায়। তাকে দেখাচ্ছে পরীর মতো নিষ্পাপ। ভিনসেন্ট তার মুখেই শুনতে চায় 'গুহ্যদ্বার' শব্দটি। সে চায় এই মেয়েটি তার পরীর মতো মুখ দিয়ে এই কথাটা উচ্চারণ করুক। ওহ। সে কীভাবেই না তা চাইছে। আমার সঙ্গে তুমিই বলো, 'গুহ্যদ্বার', 'গুহ্যদ্বার', 'গুহ্যদ্বার'। কিন্তু তা বলার মতো সাহস তার হয় না।

বদলে সে তার নিজের কথার ফাঁদে নিজেই পড়ে যায়, একই কথার জট সে পাকাতে থাকে, আর বলতে থাকে, 'দেখো, ওই গুহ্যদ্বার সমস্ত বিশ্বের পেটে-পাকস্থলীতে ছড়াচ্ছে আলো।' সে তার হাত তুলে দেখায় চাঁদটাকে, 'ওই ওপরে, দেখো, ওই যে অনন্তের গুহ্যদ্বার।'

আমি এখন ভিনসেন্টের এই আবিষ্কারের ওপরে একটু মন্তব্য না করে স্থির থাকতে পারছি না। তার এই যে গুহ্যদ্বার-আসক্তি, এটা দিয়ে সে দেখাতে চাইছে আঠারো শতকের প্রতি তার ভালোবাসা। সাদে এবং অন্য সব মুক্তমনার প্রতি তার অনুরাগ। কিন্তু এই অবসেশনকে পুরোটা প্রকাশ করতে পারার, কাজে পরিণত করতে পারার মতো শক্তি তার নেই। ফলে পরের শতকের আরেকটা উত্তরাধিকার সে কাজে লাগায়, দ্রুতই—নিজের

BanglaBook.org

মনের গোপন আসক্তির কথা সহজে প্রকাশের উপায় না পেয়ে সে আশ্রয় নেয় গীতিকবিতার। সে কথা বলে উপমায়, ইঙ্গিতে। কাজেই মুক্তির চেতনাটাকে সে বিসর্জন দেয়, তার বদলে গ্রহণ করে কবিতার চেতনা। মেয়ে মানুষের দেহ থেকে গুহ্যদ্বার চলে যায় আকাশে।

আহ। এই বদলিটা দুঃখজনক। ভিনসেন্টের এই পথ আমার পছন্দ হচ্ছে না।

সে আঠায় আটকে পড়া মাছির মতো ফেঁসে গেছে। ছটফট করছে। সে চিৎকার করে ওঠে , 'আকাশের গায়ে গুহ্যদ্বার ঈশ্বরের ক্যামেরার চোখের মতন।'

জুলি আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখছে ওদের, জুলি ভিনসেন্টের কাব্যের ঘোর ভেঙে দেয়, সে লবির আলোর দিকে আঙুল তুলে বলে, 'প্রায় সব্বাই কিন্তু চলে গেছে।'

তারা দুজনে ভেতরে যায়। সত্যি, অল্প কজন লোকই কেবল রয়ে গেছে টেবিল ঘিরে। থ্রিপিস পরা কেতাদুরস্ত লোকটা নেই। কিন্তু তার অনুপস্থিতিটাও জোরদার মনে হয় ভিনসেন্টের কাছে, সে যেন তার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এখনো। শীতল, আক্রমণাত্মক গলা। আর তার বন্ধুদের সেই হাসি। আবারো ভিনসেন্ট লজ্জা বোধ করে। এই একটা লোক তাকে এতটা বিচলিত করতে পারল কীভাবে? তাকে চুপ করিয়ে দিল কেমন করে? সে তার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, কিন্তু পারে না। তার কথা কানে বাজতে থাকে, 'আমরা সবাই এখন ক্যামেরার চোখের নিচে বসবাস করি। এখন থেকে এটাই হলো মানুষের বাস্তবতার অংশ

ভিনসেন্ট জুলিকে ভুলে যায়। একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে। এই দুটো লাইন ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে, কেতাদুরস্ত লোকটার যুক্তি মিলে যাচ্ছে ভিনসেন্টের নিজের যুক্তির সঙ্গে, অদ্ভুতভাবে। পঁতেভিঁকে ভিনসেন্ট বলেছিল, 'আপনি যদি কোনো প্রকাশ্য বিতর্কে জড়াতে চান, যদি কোনো আতঙ্ককে ডেকে আনতে চান, তাহলে আপনি নিজে নাচিয়ে না হয়ে, নাচিয়ের মতো দেখতে না হয়ে তা কী করে পারবেন?'

কারণ কি তাহলে এটাই? এই মিলের কারণেই এই কেতাদুরস্ত লোকের কথায় সে নিজে এতটা বিচলিত বোধ করছে? লোকটার চিন্তা কি ভিনসেন্টের

BanglaBook.org

চিন্তার সঙ্গে এতটাই মিলে গেছে? তাই সে নিজে প্রতিবাদ করতে পারেনি? তাহলে কি আমরা সবাই ফাঁদে আটকা পড়েছি? দুনিয়াটা একটা ফাঁদ? আমরা সবাই হঠাৎ আবিষ্কার করি যে আমাদের পায়ের নিচে নাচের মঞ্চ? আমরা তা থেকে বের হতে পারি না? তাহলে কি ভিনসেন্ট যা ভাবে আর কেতাদুরস্ত লোকটা যা ভাবে, সেসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই?

না। এ রকম ভাবনাও অসহ্য। সে কেতাদুরস্ত লোকটাকে অবজ্ঞা করে, সে দেখতে পারে না বার্ককে। তার অবজ্ঞাই তার সমস্ত বিচার-বিবেচনার আগে কাজ করে। নাছোড়বান্দার মতো ওদের চেয়ে সে কত আলাদা, সেটা সে ভাবার চেষ্টা করে। সে একটা আলো খুঁজে পায়। এরা মানুষ হিসেবে তাদের অবস্থাটাকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিয়েছে। নাচিয়েকে যেন চিরকাল নাচিয়েই থাকতে হবে। কলুর বলদের মতো। বিপরীতে, সে নিজে, এই পৃথিবীতে মানুষের একটা দশা থেকে মুক্তি নেই জেনেও, এই অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তখন তার মনে হয়, ওই কেতাদুরস্ত লোকের মুখের ওপরে তার কী জবাব ছুড়ে মারা উচিত ছিল, 'যদি ক্যামেরার নিচে বসবাস করাটা আমাদের জন্য অনিবার্য বাস্তবতা হয়েই থাকে, আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি। আমি নিজে এটা বেছে নিইনি।' এটাই হতো উপযুক্ত জবাব। সে জুলির দিকে ঝুঁকে আসে। কোনো রকমের ব্যাখ্যা ছাড়াই সে বলে, 'যে অবস্থা আমরা নিজেরা বেছে নিইনি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নাই।'

জুলি এরই মধ্যে জেনে গেছে, এই লোক এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে। এ কথা তার দারুণ লাগে। সে বেশ ঝগড়াটে গলায় বলে, 'অবশ্যই।' সে অনেক উদ্যমের সঙ্গে বলে, 'এখন চলো আমরা দুজনে তোমার রুমে যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে ওই কেতাদুরস্ত লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায় ভিনসেন্টের মাথা থেকে। সে জুলির দিকে তাকায়। জুলির কথায় বিস্মিত হয়।

জুলিও আশ্চর্য বোধ করে। বারের কাছে এখনো কিছু লোক ভিড় করে আছে। এই লোকগুলো তাকে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু এখন তার নিজেকে মনে হচ্ছে রাজকীয়, স্পর্শাতীত। এখন সে আছে ভিনসেন্টের পাশে। তার সঙ্গে গল্প করছে। ওই লোকগুলোকে তার আর আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। তার

BanglaBook.org

সামনে পড়ে আছে সোহাগভরা একটা রাত। এইটা সে অর্জন করে নিয়েছে নিজের পছন্দে। নিজের সাহসে। তার নিজেকে ওই লোকগুলোর চেয়ে মনে হচ্ছে ধনাঢ্য, সৌভাগ্যবান, শক্তিশালী।'

সে ভিনসেন্টের কানের কাছে শ্বাস ফেলে বলে, 'একপাল লিঙ্গহীন লোক ওরা।' সে জানে, এটা ভিনসেন্টের কথা, সে তার কথাই তাকে বলে এ কথা বোঝাতে যে, সে নিজেকে ভিনসেন্টের কাছে উপহার হিসেবে তুলে ধরছে। সে এখন তার।

উফ। এটা যেন ভিনসেন্টের কাছে উত্তুঙ্গ সুখের একটা গ্রেনেড তুলে দেয়। সে এখন গুহ্যদ্বারের সুন্দরতম ধারকটিকে নিয়ে নিজের রুমে যেতে পারবে। যেন দূর থেকে কেউ তাকে আদেশ করছে, আর সে তা মান্য করছে, এভাবে তার মনে হয় এইখানে একটা লন্ডভন্ড অবস্থা বানানো দরকার। সে একটা মাতালের ঘূর্ণির মধ্যে আটকে পড়ে যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে ঘুরছে গুহ্যদ্বার, আসন্ন সেক্স, কেতাদুরস্ত লোকটার বিদ্রূপ, পঁতেভিঁর প্রচ্ছায়া। পঁতেভিঁ, খানিকটা ট্রটস্কির মতো, প্যারিসের বাংকার থেকে এক বিশাল বিদ্রোহ, বিরাট বিক্ষোভ পরিচালনা করছে।

'আমরা এখন সাঁতার কাটতে যাব।' জুলিকে সে বলে। সে সুইমিংপুলের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যায়। পুলটা এখন ফাঁকা, ওপরের লোকেরা যেন দর্শক আর পুল হলো মঞ্চ। 'আমরা এখন সাঁতরাব।' সে আবারও বলে জুলিকে। সে তার প্যান্ট খুলে ছুড়ে মারে। 'তোমার কাপড় খোলো।'

৩০

ইমাকুলাতার উদ্দেশে বার্ক যে ভয়াবহ ভাষণ দিয়েছেন, তা তিনি উচ্চারণ করেছেন নিচু স্বরে ফিসফিস করে, যাতে আশপাশের লোকেরা বুঝতে না পারে আসলে কী নাটকটা এখানে মঞ্চস্থ হচ্ছে। ইমাকুলাতাও কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। বার্ক ফিরে গেলেন। ইমাকুলতা সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়ি বাইতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে যখন একা, ফাঁকা করিডর বেয়ে চলেছে

BanglaBook.org

রুমের দিকে, তখন বুঝতে পারল সে কতটা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

আধঘণ্টা পর তার ক্যামেরাম্যান, যার ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, এল রুমে। তারা দুজন মিলে একটা রুমে থাকছে। ক্যামেরাম্যান দেখল, ইমাকুলাতা বিছানায় উপুড় হয়ে আছে।

'কী হয়েছে?'

সে উত্তর দেয় না।

লোকটা তার পাশে বসে। তার মাথায় হাত রাখে। যেন তাকে সাপে ছুঁয়েছে, এমনিভাবে সে তার হাতটা সরিয়ে দেয়।

'কী হয়েছে বলবে তো আগে?'

সে কয়েকবার একই প্রশ্ন করে। তারপর শোনে, 'দয়া করে কুলি করে এসো। তোমার মুখে বাজে গন্ধ! আমি বাজে গন্ধ সহ্য করতে পারি না!'

তার মুখে মোটেও বাজে গন্ধ নেই। এটা সে জানে। সে খুব ভালোভাবে দাঁত মাজে। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সে খুঁতখুঁতে।

বাজে গন্ধর ব্যাপারটা তার মাথায় এমনি এমনি আসেনি। এটা এসেছে একটা তাজা স্মৃতি থেকে, যা সে চাপা দিয়ে রেখেছিল। বার্কের মুখের গন্ধ বাজে। এটা সে ভুলে ছিল। বার্ক তার মুখের কাছে মুখ এনে যখন তাকে গালিগালাজ করছিল, তখন তার মনের অবস্থা এ রকম ছিল না যে সে বার্কের মুখের গন্ধ নিয়ে ভাববে। কিন্তু তার মনের মধ্যে আরেকটা মন থাকে। সেই মন ঠিকই টের পেয়েছে যে বার্কের মুখের গন্ধ বাজে। বমি আসে। কিন্তু সে পাশাপাশি এই ভাষ্যও যোগ করেছে যার মুখে এত দুর্গন্ধ, তার কোনো উপপত্নী থাকতে পারে না। যদি থাকত, তাহলে সে বলে দিত। তাকে অবশ্যই বাধ্য করত মুখের গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে। যখন তার ওপর বর্ষিত হচ্ছিল গালিগালাজ, তখন এই ধারণা তার মন বলছিল, যা তাকে আশাবাদী আর সুখী করে তুলছিল যে যদিও বার্কের পাশে অনেক অনেক জাঁকাল নারী ভিড় করে থাকে, কিন্তু তিনি অনেক দিন আগেই রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, নিশ্চয়ই বিছানায় তার পাশের জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

ক্যামেরাম্যান কুলকুচা করে। সে রোমান্টিক আর বাস্তববাদী। ভাবে, তার সঙ্গিনীর মেজাজ ঠিক করার একমাত্র উপায় হলো তার সঙ্গে বিছানায়

BanglaBook.org

যাওয়া। সে তাই বাথরুমে পায়জামা পরে নেয়। তারপর মতলব নিয়ে ধীরে ধীরে বিছানার পাশে আসে।

তাকে স্পর্শ করার সাহস না পেয়ে বলে, 'বলো না কী হয়েছে?'

ইমাকুলাতা নিঠুরের মতো বলে, 'তুমি যদি এই একটা আহাম্মকের মতো লাইন ছাড়া আর কিছু বলতে না পারো, তাহলে আমার মনে হয়, তোমার সাথে কথা বলে আমার কোনো লাভ নাই।'

সে ওঠে। ওয়ার্ডরোবের কাছে যায়। খোলে। কয়েকটা পোশাক ঝুলছে। সেগুলো সে দেখে। ভালো লাগে। এই পোশাকগুলো তার মনে একটা মিথ্যা কিন্তু প্রবল আশার সঞ্চার করে, সে ওই দৃশ্যপট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে না, সে তার অবমাননার পরিপার্শ্বের ভেতর দিয়ে আবার যাবে, সে হার মেনে নেবে না, যদি পরাজয় আসেই, এটা নিয়ে সে একটা নাটক বানাবে, সেই নাটকে সে তার আহত সৌন্দর্য আর বিদ্রোহী গর্ব নিয়ে নিজেকে তুলে ধরবে।

'তুমি কী করছ? কই যাচ্ছ?'

'তাতে কিছুই যায় আসে না। শুধু একটা কথা সত্য আমি আর তোমার সঙ্গে থাকছি না।'

'কিন্তু বলো কী হলো?'

ইমাকুলাতা তার পোশাক দেখে বলে, 'ছয়বার একই কথা বলা হলো।' আমি আপনাদের বলতে পারি যে তার গণনা নির্ভুল হয়েছে।

'তুমি ঠিক বলেছ। তোমার বার্ক প্রজেক্ট ঠিকঠাকমতো হবে। আমি আমাদের রুমের জন্য এক বোতল শ্যাম্পেন অর্ডার করেছি।'

'তুমি যা ইচ্ছা খাও যার সাথে ইচ্ছা খাও।'

'কিন্তু কী হয়েছে বলবে তো?'

'সাতবার। তোমার সাথে আমার আজই শেষ। চিরকালের জন্য। তোমার মুখ দেখে দুর্গন্ধ আসে। যথেষ্ট সহ্য করেছি। আর না। তুমি আমার জীবনের দুঃস্বপ্ন। তুমি আমার খারাপ স্বপ্ন। তুমি আমার জীবনের এক বিশাল ব্যর্থতা। আমার লজ্জা। আমার অবমাননা। আমার বিরক্তি। আমার অবশ্যই এটা তোমাকে জানানো উচিত। আমার এ ব্যাপারে কোনো দোনোমনা করা উচিত না। নিষ্ঠুরভাবে বলে দেওয়া উচিত। আমি আর

BanglaBook.org

দুঃস্বপ্ন বয়ে বেড়াতে চাই না। এই সব অর্থহীন কর্মকাণ্ড আর না।'

সে ওয়ার্ডরোবের দিকে মুখ করে পোশাকের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে। ধীরে ধীরে। অনুচ্চ স্বরে। শান্তভাবে। হিসহিস করে। তারপর সে তার কাপড় খুলতে থাকে।

৩১

মেয়েটি তার সামনে এভাবে কোনো রকম সৌজন্য ছাড়া, এতখানি অশ্রদ্ধা নিয়ে আর কখনো কাপড় ছাড়েনি। এই বস্ত্রবিসর্জন থেকে একটা বার্তাই আসছে আমার সামনে তোমার এই উপস্থিতির কোনোই গুরুত্ব নেই। একদমই না। তোমার থাকা আর একটা কুকুরের থাকা, একটা ইঁদুরের থাকা সমান কথা। তোমার চেয়ে থাকা দিয়ে আমার একটা কোষও উত্তেজিত হবে না। তোমার সামনে আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি। যে কোনো বাজে কাজ। যেমন আমি তোমার সামনে বমি করতে পারি। আমার কান পরিষ্কার করতে পারি। আমার দুপায়ের জোড় ধুতে পারি। মাস্টারবেট করতে পারি। পেশাব করতে পারি। তুমি হলে একটা চক্ষুহীন, কর্ণহীন, মুণ্ডুহীন। আমার গর্বোদ্ধত অশ্রদ্ধা হচ্ছে একটা ছদ্মবেশ, যা দিয়ে আমি তোমার সামনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, পরিপূর্ণ অশ্রদ্ধা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি।

ক্যামেরাম্যান দেখতে পায় তার চোখের সামনে তার প্রেমিকার শরীর বদলে যাচ্ছে। যে শরীর এত দিন তাকে দ্রুত আর সরলভাবে নিজেকে উপহার দিয়ে এসেছে, আজ তা উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, একশ মিটার বেদির ওপরে স্থাপিত একটা গ্রিক ভাস্কর্য হয়ে উঠছে। কামনায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এটা এক অদ্ভুত কামনা। এটা শারীরিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না। এটা কাজ করছে মাথায়, শুধুই মাথায়। মস্তিষ্কের কোষে এক দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। সাধু পাগলামো। নিশ্চিতভাবে শুধু এই শরীর, শুধু এই শরীর পারে তার জীবনকে, পুরো জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে।

BanglaBook.org

মেয়েটি এই মুগ্ধতা এই নিবেদন তার চামড়ার মধ্যে অনুভব করে। তার মাথা পর্যন্ত একটা শীতল প্রবাহ উঠে যায়। সে বিস্মিত বোধ করে। এর আগে কখনো এই রকমের একটা তরঙ্গ সে অনুভব করেনি। একটা শীতল ঢেউ, যেমনটা হয় উষ্ণতার প্রবাহ, মমত্বের ঢেউ, ক্রোধের তরঙ্গ। এই শৈত্যের মানে হচ্ছে এ হলো ভালোবাসা, অনুরাগ। ক্যামেরাম্যানের একচ্ছত্র নিবেদন আর বার্কের একচ্ছত্র প্রত্যাখ্যান একই মুদ্রার দুই পিঠ। যার বিরুদ্ধে মেয়েটি লড়াই করছে। যেনবা, বার্কের এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান চাইছে যে সে তার প্রেমিকের কাছে ফিরে যাক, তার প্রেমিকের আলিঙ্গনের মধ্যে আশ্রয় নিক। এই প্রত্যাখ্যানের আঘাত ঠেকিয়ে দেবার একটাই ঢাল আছে, তা হলো, তার প্রেমিককে ঘৃণা করা। এই কারণে মেয়েটি ছেলেটিকে এত জোরালোভাবে, ভয়ংকরভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে। চাইছে যে ছেলেটি পরিণত হোক একটা ইঁদুরে, ইঁদুরটা পরিণত হোক একটা মাকড়সায়, মাকড়সা পরিণত হোক একটা মাছিতে, সেই মাছিটাকে গ্রাস করুক আরেকটা মাকড়সা।

ইমাকুলাতা আরেকটা পোশাক পরে নেয়। একটা সাদা ড্রেস। সে নিচে যাবে। বার্ক এবং অন্যদের সামনে তুলে ধরবে নিজেকে। এই সাদা ড্রেসটা আনায় সে খুশি। সাদা হলো বিয়ের পোশাকের রং। আজ হলো বিয়ের দিন। একটা উল্টো বিয়ের দিন। বর ছাড়া একটা ট্র্যাজিক বিয়ে। সাদা পোশাকের নিচে সে বয়ে বেড়াচ্ছে একটা অন্যায্য ক্ষত। সে অনুভব করছে, এই অন্যায্যতাই তাকে আরো মহান করে তুলেছে। যেকোনো ট্র্যাজেডিতে তার চরিত্রগুলো যত বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে, তত বেশি মহান হয়ে ওঠে। সে দরজার দিকে যায়। সে জানে, পায়জামা পরা লোকটা তাকে অনুসরণ করবে। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো পায়ে পায়ে চলে আসবে। এভাবেই সে হোটেল-প্রাসাদে চলতে চায়। সে যাবে রানির মতো, পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করবে একটা কুকুর।

BanglaBook.org

৩২

যে লোকটিকে সে কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে, সে তাকে বিস্মিত করে। সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার চোখমুখ রাগে ফুঁসছে। তার আত্মনিবেদনের ইচ্ছা অকস্মাৎ উধাও। মেয়েটি তার প্রতি যে অবিচার করছে, তাকে যে অবমাননা করছে, তার প্রতিবাদ করার এক প্রবল ইচ্ছায় সে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে তাকে চড় মারার, কিল মারার, তাকে বিছানায় ছুড়ে মারার, তাকে ধর্ষণ করার মতো রণসজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে তোলার সাহস পায় না। একটা কিছু করা, অপূরণীয়, একটা কিছু প্রচণ্ড অশ্লীল, আগ্রাসী— এই তাড়না সে বোধ করে।

সে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। মেয়েটি বলে, 'আমাকে যেতে দাও।'

'আমি তোমাকে যেতে দেব না।' ছেলেটি বলে।

'আমার জীবনে তোমার কোনো অস্তিত্ব আর নাই।'

'কী বলতে চাও। আমার অস্তিত্ব নাই?'

'আমার জানা নাই।'

'তুমি আমাকে চেনো না, না? সকালবেলায়ই আমরা ফা- করেছি।'

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলব না। বিশেষ করে ওই শব্দ ব্যবহার করবে না।'

'আজ সকালেই তুমি এই শব্দ বারবার ব্যবহার করেছ। তুমি বলেছ, ফা- মি ফা- মি ফা- মি।'

'এটা ততক্ষণ যতক্ষণ আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন', সে কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে বলে, 'এখন এই কথা অশ্লীল।'

সে চিৎকার করে বলে, 'আমরা তো ফা- করেছি। তাই না?'

'আমি তোমাকে নিষেধ করছি।'

'আর গত রাতে আমরা ফা- করেছি, ফা- করেছি, ফা- করেছি।'

'চুপ করো।'

'এটা কী করে হয় যে তুমি সকালবেলা আমার শরীরটা নিতে পারলা আর এখন না।'

BanglaBook.org

'তুমি জানো আমি অশ্লীলতা অপছন্দ করি।'

'আমি তোমার পছন্দ-অপছন্দের নিকুচি করি। তুমি একটা বেশ্যা।'

আহ। তার এই শব্দটা চয়ন করা ঠিক হলো না। এটা বার্ক মেয়েটাকে বলেছে। মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে, 'অশ্লীলতা একটা নোংরা ব্যাপার। তুমি হলে নোংরা।'

'তাহলে তুমি তার সঙ্গে শুয়েছ, যাকে তোমার মনে হয় চূড়ান্ত নোংরা। যাকে একটা নারী মনে করে ভয়াবহ নোংরা, তার সঙ্গে তারপরও শোয়, সেই নারীকেই বলা হয়ে থাকে বেশ্যা। বেশ্যা বেশ্যা বেশ্যা।'

ক্যামেরাম্যানের কথা স্থূল থেকে স্থূলতর হতে থাকে। ইমাকুলাতা ভয় পায়।

ভয়? সে কি আসলেই তাকে ভয় পায়? আমি তা বিশ্বাস করি না মেয়েটি তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে, ছেলেটির এই বিদ্রোহ কোনো বড় ব্যাপার নয়। ছেলেটি আসলে আত্মনিবেদিত। তার এই আত্মনিবেদনে মেয়েটির আস্থা আছে। মেয়েটি জানে, ছেলেটি তাকে বিদ্রূপ করছে যাতে করে সে ছেলেটির কথা শোনে। সে তাকে দেখে। তার কথা বিবেচনায় নেয়। ছেলেটি গালিগালাজ করছে, কারণ সে দুর্বল। তার একমাত্র শক্তি হলো স্থূলতা, তার এই আগ্রাসী কথামালা। যদি মেয়েটি তাকে ভালোবাসত, এককণা ভালোবাসাও তার থাকত, তাহলে সে ছেলেটির এই মরিয়া ক্ষমতাহীনতা দিয়ে অভিভূত হয়ে পড়ত। কিন্তু অভিভূত না হয়ে সে একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছে ছেলেটিকে আঘাত করার। সে কারণেই সে ছেলেটির কথাকে নিচ্ছে আক্ষরিক অর্থে, তার আঘাতকে বিশ্বাস করছে, সেসবকে ভয় পাচ্ছে। ছেলেটির মুখের দিকে সে কারণেই তাকাচ্ছে ভীতা হরিণীর মতো করে।

ছেলেটি ইমাকুলতার চোখে-মুখে দেখতে পায় ভয়। সে উৎসাহ বোধ করে। সাধারণত ছেলেটিই ভয় পায়। সাধারণত ছেলেটিই পথ করে দেয়। সেই সাধারণত মাফ চায়। হঠাৎ করে সে রেগে গেছে বলে ঘটনা ঘটল উল্টোটা। এখন মেয়েটির চোখে-মুখে দেখা যাচ্ছে ভয়। শুধু ছেলেটি শক্তি প্রদর্শন করেছে বলে। মেয়েটি কাঁপছে। মেয়েটি তার নিজের দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ভেবে ছেলেটি তার গলা আরো চড়িয়ে দেয়। সে তার

BanglaBook.org

বাজে কর্কশ আগ্রাসী বামনত্ব ঝাড়তে থাকে। আহা বেচারা। সে জানে না, মেয়েটি এখনো তার নিজের খেলা খেলছে, নিজের চাল চালছে, যখন ছেলেটি ভাবছে, এই মুহূর্তে সে তার ক্রোধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আর স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছে।

মেয়েটি বলে, 'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। তুমি ঘৃণা ছড়াচ্ছ, তুমি সহিংস।' বেচারা। সে জানে না, এই অভিযোগ আর কোনো দিনও রদ হবে না, এই সামান্য ভালোত্ব এবং আনুগত্য দেখিয়ে মেয়েটি ছেলেটিকে চিরদিনের জন্য ধর্ষক, আগ্রাসী বানিয়ে ফেলবে।

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।' বলে মেয়েটি ছেলেটিকে সরিয়ে রুম থেকে বের হয়ে চলে যায়।

আর ছেলেটি অনুগত কুকুরের মতো রানির পেছনে পেছনে চলতে থাকে।

৩৩

নগ্নতা। আমার কাছে এখনো ১৯৯৩ সালের অক্টোবরের একটা 'নুভেল উবজাভেটা'র ক্লিপিং আছে। একটা জনমত জরিপ : বারো শ আত্মস্বীকৃত বামপন্থীর কাছে পাঠানো হলো ২১০টি শব্দ। তাদের বলা হলো এর মধ্যে থেকে তোমাদের কাছে কোন শব্দগুলো সবচেয়ে আকর্ষণীয়, সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়, তাদের নিচে দাগ দাও। এর আগেও এ রকম একটা জরিপ করা হয়েছিল, তখন এই ২১০টি শব্দই পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে তারা ১৮টি শব্দ বেছে নিয়েছিল। তা থেকে বোঝা গিয়েছিল বামদেরও কিছুটা সংবেদনশীলতা আছে। ১৯৯৩ সালে তিনটা শব্দে নেমে আসে জরিপের ফল। মাত্র তিনটা শব্দ! আর সেই তিনটা শব্দ কী? বিদ্রোহ, লাল ও নগ্নতা। বিদ্রোহ, লাল তো আসবেই। এ দুটো শব্দ বাদ দিলে কেবল 'নগ্নতা' শব্দটিই বামদের হৃৎপিণ্ডে চাঞ্চল্য তৈরি করে। কেবল 'নগ্নতা'ই তাদের সম্মিলিত প্রতীকী উত্তরাধিকার,

BanglaBook.org

এটা বিস্ময়করভাবে উল্লেখযোগ্য। এটা কি আমাদের ফরাসি বিপ্লব প্রবর্তিত দুই শ বছরের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মোট মহান সম্পদ? এই কি আমরা পেলাম হবেস্পিয়া, দতোঁ, জহেস, লুক্সেমবার্গ, আরাগঁ, চে গুয়েভারা, লেনিন, গ্রামসি প্রমুখের কাছ থেকে? নগ্নতা? নগ্ন পেট, নগ্ন অণ্ড, নগ্ন নিতম্ব? এটা কি বাম ব্রিগেডের শেষ বিশাল মার্চ পাস্টে বয়ে নিয়ে যাওয়া শেষ পতাকা?

কিন্তু নগ্নতাই কেন, অবিকলভাবে? যাদের কাছে জরিপকারী সংস্থা এই শব্দগুলো পাঠিয়েছিল, যারা এই শব্দটির নিচে দাগ দিয়েছিলেন, তাদের কাছে নগ্নতা কথাটার অর্থ আসলে কী ছিল?

আমার মনে পড়ে জার্মানিতে ১৯৭০-এর দশকে বামপন্থীরা রাজপথে মিছিল বের করেছিলেন একটা কিছুর প্রতিবাদ করতে (একটা আণবিক শক্তিকেন্দ্র, বা একটা যুদ্ধ, বা টাকার ক্ষমতা, কিছু একটার প্রতিবাদে, আমার ঠিক মনে নেই)। তারা প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের পোশাক খুলে ফেলে, জার্মানির নগরের রাস্তায় তারা যাচ্ছিলেন চিৎকার করতে করতে।

তাদের নগ্নতার মানে কী ছিল আসলে?

প্রথম অনুমান : তাদের কাছে এটা ছিল আচরিত সব ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা। যে মূল্যবোধটা সবচেয়ে বিপন্ন। জার্মান বামপন্থীরা তাদের লিঙ্গগুলো নিয়ে সেইভাবে রাজপথ ধরে যাচ্ছিল, যেমন করে নির্যাতিত খ্রিষ্টানদের কাঁধে করে কাঠের ক্রুশ নিয়ে যেতে হতো মৃত্যুর দিকে।

দ্বিতীয় অনুমান জার্মান বামপন্থীরা কোনো একটা মূল্যবোধের প্রতীক বয়ে নিতে নগ্ন হয়নি, তারা আসলে দর্শকদের রুচিতে আঘাত করতে চেয়েছিল। আঘাত করতে, ভয় দেখাতে, রাগান্বিত করতে! হাতির মলের মতো বর্ষণ করো। দুনিয়ার আবর্জনা নিক্ষেপ করো!

কিন্তু একটা কৌতূহলোদ্দীপক উভয়সংকট : নগ্নতা কি সব মূল্যবোধের সেরা মূল্যবোধ? নাকি এটা শত্রুর ওপরে ছুড়ে মারা সন্ত্রাসী বোমার মতো একটা চূড়ান্ত অশ্লীলতা!

এবং তাহলে এর মানে কী দাঁড়ায়, যখন ভিনসেন্ট জুলিকে বলে, 'তোমার কাপড় খুলে ফেলো।' আরো যোগ করে, 'ওই আকামাগুলোর

BanglaBook.org

সামনে আমরা ঘটাব এক বিশাল ঘটনা।'

আর জুলির কাছে এর মানে কী দাঁড়ায়? যে এই কথা মান্য করে, শুধু তা-ই নয়, বরং তারই উৎসাহ যেন বেশি, বলে, 'কেন নয়?' তার জামার বোতাম খুলতে থাকে সে।

৩৪

সে ন্যাংটো। সে নিজেই বিস্মিত। সে এমন করে হাসতে থাকে যে তার গলা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই হাসি সে জুলিকে শোনাচ্ছে না। শোনাচ্ছে নিজেকে। কারণ সে এ রকম পরিবেশে নগ্ন হতে অভ্যস্ত নয়। এ রকম একটা বিশাল কাচে ঘেরা জায়গায়। কী অদ্ভুত ব্যাপারটা। ব্যাপারটা আজগুবি, এই আজগুবি ভাবটাই তাকে হাসাচ্ছে।

জুলি তার ব্রা ছুড়ে ফেলেছে, প্যান্টি খুলে ফেলেছে। তবু ভিনসেন্ট তাকে দেখছে না। সে শুধু বুঝতে পারে যে মেয়েটি ন্যাংটো। কিন্তু সে জানে না ন্যাংটো হলে মেয়েটিকে কেমন দেখায়। মনে রাখতে হবে, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে মেয়েটির গুহ্যদ্বারের প্রতিচ্ছবি নিয়ে ঘোরগ্রস্ত ছিল। সেটা তার এখনো মনে আছে। সে কি এখনো সেটাই ভাবছে? মেয়েটির রেশমি প্যান্ট যখন আর পরনে নেই, গুহ্যদ্বার মুক্ত? না। গুহ্যদ্বার তার মাথা থেকে উবে গেছে। না। মেয়েটির নগ্ন শরীর, তার কাছে যাওয়া, সেটাকে উপলব্ধি করা, সেটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা—এসব না করে সে চলে গেল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

একটা আজব যুবক। এই ভিনসেন্ট। সে নাচিয়েদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। সে চাঁদ বিষয়ে অনর্গল কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে একটা উদ্দীপিত কর্মী। সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার কাটে। সে তার নিজের নগ্নতার কথা ভুলে যায় দ্রুত। ভুলে যায় জুলির নগ্নতার কথা। শুধু সে তার নিজের হাত-পা চালানোর দিকেই মনোযোগ দেয়। তার পেছনে জুলি। সে ডাইভ দিতে জানে না। সে মই ধরে সাবধানে নামে। ভিনসেন্ট তাকে

BanglaBook.org

দেখার জন্য মাথা ঘোরায় না পর্যন্ত। এটা তার লোকসান। কারণ, জুলি তো চমৎকার, অপরূপা, প্রেমময়! তার শরীর দীপ্তি ছড়াচ্ছে। এটা তার বিনয়ের দীপ্তি নয়। এটা হলো, কেউ তাকে দেখছে না, ভিনসেন্টের মাথা পানির নিচে, এই আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। সে মইয়ের ধাপ বেয়ে নামে, পানি তার শরীরের গোপন জায়গাগুলোতে ঠান্ডা স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। তার মনে হয়, সে আরো নিচে নামে। কিন্তু তার সাহস হয় না। খানিকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সময় নেয়। সে সিঁড়ির এক ধাপ নিচে পা রাখে। এখন পানি তার নাভি পর্যন্ত। সে হাত ডোবায় পানিতে। আদর করে। সে পানি তুলে বুক শীতল করে। উফ। তাকে যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। বেচারা ভিনসেন্ট। সাদাসিধে। সে তা বুঝতে পারছে না কী হারাচ্ছে সে। তবে আমি ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখি। অবশেষে সেই নগ্নতাকে পাওয়া গেল, যার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক নেই, অশ্লীলতার সম্পর্ক নেই, বিশুদ্ধ নগ্নতা, সব ধরনের চাপিয়ে দেওয়া অর্থ থেকে যা মুক্ত, নগ্নকৃত নগ্নতা, একজন পুরুষের জন্য মনোরম।

তারপর জুলি সাঁতার কাটতে শুরু করে। ভিনসেন্টের চেয়ে সে অনেক আস্তে আস্তে সাঁতরায়। তার মাথা এলোমেলোভাবে পানির ওপরে তোলা। ভিনসেন্ট ৩১৫ মিটারের একটা পাক ঘুরে এসেছে। জুলি মইয়ের দিকে যায়। ভিনসেন্ট তাড়াতাড়ি তার পিছু নেয়। তারা মইয়ের মাথায় পৌঁছালে ওপর দিকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

অদৃশ্য আগন্তুকদের মাধ্যমে উদ্দীপিত হয় ভিনসেন্ট, সে বনদেবতার মতো মুখে হাসি এনে ছুটে যায় জুলির দিকে, গায়ের জোরে চেঁচিয়ে বলে, আমি তোমাকে দেখো না কী করি, সে তার পেছনে গিয়ে হামলে পড়ে।

এটা কী রকম ব্যাপার? যখন তারা হাঁটছিল, কেউ ছিল না কোথাও, তখন ভিনেসন্ট জুলির সামনে একটাও বাজে কথা, অশ্লীল আচরণ করতে সাহস পায়নি। এখন মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সবাইকে শোনানোর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সে এসব কথা জোরে জোরে বলছে?

কারণ, যতক্ষণ সে অন্তরঙ্গ ছিল, একা ছিল, ততক্ষণ সে ছিল অনুচ্চ। একটা বদ্ধ ছোট্ট জায়গায় একটা কথা বলা, আর একটা নাট্যশালায় একটা কথা জোরে বলার মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, নাট্যশালায় বলা একটা কথার ব্যাপারে কথকের নিজের দায়দায়িত্ব পুরোটা থাকে না। যখন মঞ্চে

BanglaBook.org

কেউ তার সঙ্গীর উদ্দেশে কোনো কথা বলে, তাকে জোরে বলতে হয়, যেন সব দর্শক শুনতে পায়। যারা সেখানে আছে, তারা তার দিকে তাকিয়েই আছে। সত্য বটে, এখন এই নাট্যমঞ্চটা ফাঁকা, থিয়েটার হলে লোক নেই, কিন্তু সেখানে আছে কাল্পনিক এবং কল্পিত দর্শক, বাস্তব এবং অবাস্তব।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দর্শক কারা? আমি মনে করি না যে ভিনসেন্ট তার দর্শক হিসেবে এই সম্মেলনের লোকগুলোর কথা কল্পনা করছে। বরং তার কল্পনার দর্শকেরা বিমূর্ত, আবছায়া, চেহারাবিহীন। তার মানে কি এই নয়, একজন নাচিয়ে যে দর্শকদের প্রত্যাশা করে, এরা হলো সেই দর্শক? সেই যে অদৃশ্য দর্শক, যাদের নিয়ে পঁতেভিঁ তত্ত্ব কপচাচ্ছেন? সম্পূর্ণ বিশ্ব। অগণন মুখচ্ছবিহীন মানুষ। বিমূর্ততা!

তা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, ভিনসেন্টের মনের মধ্যে দর্শকের একটা আকার আছে। অচেনা নামহীন রক্তঘূর্ণির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে চেনা মানুষের মুখ। পঁতেভিঁ, আর তার সঙ্গীরা। তারা আমোদের সঙ্গে দেখছে ভিনসেন্টকে। দেখছে পুরো দৃশ্যটা। দেখছে জুলিকে। তাদের জন্য আসলে ভিনসেন্ট উচ্চ স্বরে কথা বলছে, তাদের প্রশংসা সে চায়। সে চায় তাদের স্বীকৃতি। তাদের চিত্তজয়ের বাসনাই তার ভেতরে কাজ করছে।

'তুমি আমাকে ইয়ে করতে পারবে না!' জুলি তো আর পঁতেভিঁকে চেনে না। কাজেই সে পঁতেভিঁর জন্য চিৎকার করে না। সেও চিৎকার করে কোনো এক অদৃশ্য দর্শকসারির জন্যই। যারা সেখানে নেই, সেখানে থাকতে পারত। সে-ও কি দর্শকদের প্রশংসা চায়? হ্যাঁ। সেও চায়। কিন্তু সে এটা চাইছে কেবল ভিনসেন্টকে খুশি করার জন্য। সে তাদের অদেখা-অজানা দর্শকদের হাততালি পেতে চাইছে শুধু এ আশায় যে এই মানুষটাকে ভালোবাসবে, যাকে সে আজকের রাতের জন্য বাছাই করেছে, কে জানে হয়তো আরো বহু রাত তারা একসাথে কাটাবে। সে সুইমিংপুলের চারদিকে দৌড়ায়। তার স্তন দুটো এদিক-ওদিক দুলতে থাকে আনন্দে।

ভিনসেন্টের কথামালা আরো বেশি সাহসী আর দুর্বার হয়ে ওঠে, কেবল এগুলোর রূপকার্থই এগুলোকে ঢেকে রাখে রহস্যের ঢাকনায়, এগুলোকে অশ্লীল হতে দেয় না।

'আমি আমার শিশ্ন তোমার ভেতরে ঢুকিয়ে ওই দেয়ালের সঙ্গে তোমাকে

BanglaBook.org

পেরেকে গেঁথে রাখব।'

'তুমি আমাকে গাঁথতে পারবে না।'

'তুমি এই সুইমিংপুলের ছাদে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলে থাকবে।'

'আমি ওখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলে থাকব না।'

'আমি তোমার গুহ্যদ্বার সমস্ত পৃথিবীর জন্য মেলে ধরব, যেন সবাই দেখতে পারে।'

'তুমি মেলে ধরবে না।'

'প্রত্যেকেই তোমার পাছা দেখবে।'

'কেউই আমার পাছা দেখবে না।' জুলি চিৎকার করে।

এই সময় আবারও বাইরে লোকজনের আওয়াজ শোনা যায়। জুলি ধীরে পা ফেলে। থামার ভাব করে। কেবল সে আর্তনাদ করতে থাকে, ধর্ষণের ভয়ে ভীতা নারীর মতো করে। ভিনসেন্ট তাকে ধরে মেঝেতে পড়ে যায়। জুলির চোখ বিস্ফারিত। সে অপেক্ষা করে কখন ঢুকবে। সে বাধা দেবে না। সে তার পা দুটো মেলে ধরে। চোখ বোজে। মাথাটা এক দিকে কাত করে।

৩৫

ভেতরে ঢোকার ঘটনা ঘটে না। এটা ঘটে না, কারণ ভিনসেন্টের জিনিসটা ছোট্ট। একটা শুকনো স্ট্রবেরির মতো। দাদিমার আঙুলের ডগায় পরা ঢাকনির মতো।

এটা এত ছোট কেন?

আমি সরাসরি এটা ভিনসেন্টের ওই অঙ্গটাকেই জিগ্যেস করেছিলাম, বাবু, তুমি এত ছোট কেন? সে বলেছে, 'কেন আমি ছোট হব না? আমি তো বড় হওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করিনি। বিশ্বাস করুন, আমার মধ্যে এই ভাবনাটা কাজই করেনি। আমাকে তো আগে কেউ সতর্ক করেনি। ভিনসেন্ট আর আমি দুজনেই মেয়েটির আলগা দৌড়টা দেখেছি। সুইমিংপুলের চারপাশ ঘিরে দৌড়। অনেক মজার ছিল। এখন তুমি

BanglaBook.org

ভিনসেন্টকে পুরুষত্বহীনতার দোষে অভিযুক্ত করতে চাইছ? ক্ষমা করো। সেটা আমার ওপরে একটা বিশাল অপরাধবোধের বোঝা চাপিয়ে দেবে। এটা হবে অন্যায়। কারণ, আমি আর ভিনসেন্ট দুজনেই একতালে চলি। আমি কখনোই তাকে ডোবাইনি। বিশ্বাস করো। আমরা দুজন দুজনকে নিয়ে গর্বিত। আমি তাকে নিয়ে আর সে আমাকে নিয়ে।'

নুনু ঠিক কথাই বলছিল, সত্য কথা। ভিনসেন্টও এই জন্য তার যন্ত্রটাকে কোনো রকমের দোষ দিচ্ছে না। যদি এটা ঘটত তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বদ্ধ ঘরে, তাহলে ভিনসেন্ট কোনো দিনও নিজের লিঙ্গকে ক্ষমা করে দিতে পারত না। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সে বরং তার যন্ত্রের আচরণকে সঠিক বলেই মনে করে। যৌক্তিক এবং সঠিক। কাজেই ব্যাপারটা যে রকম ঘটে গেছে সে রকমই থাকুক। সে ভান করে যে একটা রতিক্রিয়া ঘটে গেছে।

জুলিও কাউকে দায়ী করে না। হতাশও হয় না। সে তার প্রেমিকের শরীরের ওঠানামা তার শরীরের ওপরে অনুভব করে। কিন্তু আশ্চর্য হয় কিছুই ঢুকছে না দেখে। তবু সে নিজের শরীরের অংশ নাড়তে থাকে। সে তার প্রেমিকের নড়াচড়ার জবাব দেয়।

মানুষের গলার আওয়াজ আর শোনা যায় না। বরং পুলে কেউ একজন আসছে, তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।

ভিনসেন্টের শ্বাস দ্রুততর হয়, উচ্চ স্বরে বের হতে থাকে। সে গোঙায়। হাপরের মতো হাঁসফাঁস করে। জুলিও ঘোঙায়, ফোপায়, কিছুটা এ কারণে যে ভিনসেন্টের ভিজে শরীর তাকে ব্যথা দিচ্ছে, বারবার তা উঠছে নামছে, আর কিছুটা তার প্রেমিকের গর্জনের প্রত্যুত্তর দিতে।

BanglaBook.org

৩৬

চেক বিজ্ঞানী এই মিথুনরত যুগলকে এড়াতে পারেন না, কারণ তিনি তাদের দেখতে পান একেবারে শেষ মুহূর্তে। তিনি এমন ভাব করেন যে এরা এখানে নেই। তিনি তার চোখ অন্য কোনো দিকে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি নার্ভাস

বোধ করেন। তিনি পশ্চিমের জীবন সম্পর্কে পরিচিত নন। কমিউনিস্ট আমলে সুইমিংপুলের পাশে সঙ্গম করা অসম্ভব ছিল। তাই তিনি এখন অনেক কিছুই খুব মনোযোগের সঙ্গে শিখছেন। তিনি সুইমিংপুলের অপর প্রান্তে চলে এসেছেন। এখন তিনি একবার এই মিথুনরত যুগলের দিকে চকিত দৃকপাত করতে পারেন বটে। কারণ, তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘ্যান ঘ্যান করছে। যে পুরুষ মানুষটা ওইখানে সঙ্গমে রত, সে কি পেটানো শরীরের? বডি বিল্ডিংয়ের জন্য কোনটা ভালো কাজ করে, নির্মাণশ্রমিকের কাজ, নাকি যৌন মিলনের কাজ? কিন্তু তিনি নিজেকে নিবৃত্ত করেন, কারণ তিনি একজন দৃষ্টিকামী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান না।

তিনি পুলের বিপরীতে থামেন। সেখানে তিনি ব্যায়াম করা শুরু করেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানো, পা অনেক উঁচুতে তোলা। তারপর তিনি হাতের ওপরে উল্টো হয়ে দাঁড়ান। ছোটবেলায় হ্যান্ডস্ট্যান্ড করেন। তখন তার মনে হয়, কজন ফরাসি বিজ্ঞানী হ্যান্ডস্ট্যান্ড পারবে? মন্ত্রীদের কজন পারবে? তিনি একে একে তার পরিচিত ফরাসি মন্ত্রীদের নাম আর ছবি কল্পনা করেন, ভাবেন যে এরা সবাই হ্যান্ডস্ট্যান্ড দিচ্ছে, কিন্তু তার কল্পনার ছবিতে দেখা যায় মন্ত্রীদের হ্যান্ডস্ট্যান্ড ভালো হচ্ছে না। তারা খুবই দুর্বল। সাতবার নিজের হাতের ওপর দাঁড়িয়ে চেক বিজ্ঞানী উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। আবারও তিনি তার হাতের ওপরে দাঁড়ান।

৩৭

জুলি কিংবা ভিনসেন্ট দুজনের কেউই তাদের আশপাশে কী হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবছে না। তারা প্রদর্শনকামী নয়। অন্যরা তাদের দেখছে, এই ভাবনা তাদের কামোত্তেজিত করে না। এটা কোনো অর্জি নয়, তারা একটা শো করছে। মঞ্চে অভিনয়ের সময় অভিনেতারা দর্শকদের চোখের দিকে তাকায় না। বিশেষ করে জুলি ঠিক করেছে সে আশপাশের কোনো কিছুর দিকে তাকাবে না। কিন্তু হঠাৎ একজনের এমন তীব্র দৃষ্টি তার চোখে পড়ে যে

BanglaBook.org

তাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সে চোখ তোলে। মেয়েটিকে দেখে। একজন নারী, জাঁকাল সাদা পোশাক পরা। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি অদ্ভুত, দূরাগত, কিন্তু খুব ভারী, হতাশার মতো ভারী, আমি-কিছু-জানি না-ধরনের ভারী। এই ওজনের নিচে পড়ে জুলির নিজেকে মনে হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার নড়াচড়া ধীর হয়ে আসে, দু-চারটা শীৎকারের পর সে নীরব হয়ে যায়।

সাদা পোশাক পরা নারীটি ভীষণ তাড়না অনুভব করছে, নিজেকে দমানোর চেষ্টা করছে, তার মনে হচ্ছে সে চিৎকার করে উঠবে। এই তাড়না থেকে সে মুক্তি পায় না। কারণ সে যে মানুষের জন্য চিৎকারটা করে উঠবে সেই মানুষটাই তা শুনবে না। কেমন লাগে? সে আর নিজেকে দমন করতে পারে না, তার বুক ভেঙে বেরিয়ে আসে চিকন ভয়াবহ কান্না।

জুলি তার রতিক্রিয়া থেকে উঠে আসে। তার অন্তর্বাসগুলো তুলে নিয়ে পরে ফেলে। তার রংচটা পোশাকগুলো পরে দ্রুত একটা দৌড় ধরে।

ভিনসেন্ট ধীর। শার্টটা খুঁজে নেয়। প্যান্ট। কিন্তু তার আন্ডারওয়্যার কোথাও খুঁজে পায় না।

খানিকটা পেছনেই একটা পায়জামা পরা লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কেউ দেখছে না। সে-ও কাউকে দেখছে না। সে তার দৃষ্টি ফেলে সাদা পোশাকের মেয়েটার ওপর।

৩৮

বার্ক তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ কথা সে মনে করতে চায় না। বার্ককে সে উত্তেজিত করতে চায়। তাই সে এই পাগলের বুদ্ধি বের করেছে। একটা সাদা পোশাক পরে সে প্যারেড করবে। কে না জানে ইমাকুলাতা মানে অকলঙ্কিতা, দাগহীন, সাদাই তো তার উপযুক্ত পোশাক। কিন্তু তার কপাল মন্দ। তার এই হোটেল লবি প্রদক্ষিণটা বৃথা গেল। কারণ বার্ক অনেক আগেই জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে। ক্যামেরাম্যান তাকে অনুসরণ

BanglaBook.org

করছে। এ অনুসরণ একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো নয়। বরং আওয়াজ করছে সে। চিৎকার করছে অপ্রীতিকর গলায়। ইমাকুলাতা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে বটে, কিন্তু সেটা বেশ নোংরা কদাকার দৃষ্টি আকর্ষণ। তাই সে তার হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে এক পাল্লায় সে পৌঁছে যায় সুইমিংপুলের প্রান্তে। সেখানে একটা যুগল যৌন মিলনে রত। সে তখন চিৎকার করে কাঁদে।

এই কান্না তাকে জাগিয়ে তোলে। চারপাশটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ক্যামেরাম্যান তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর সামনে পানি। সে বুঝতে পারে তার মুক্তি নেই। একমাত্র মুক্তির পথ হলো একটা পাগলামো করা। একমাত্র যৌক্তিক পথ হলো উন্মত্ত হওয়া। তাই সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে পাগলামোর পথটাই নেয়, দুই পা এগিয়ে পানিতে পড়ে যায়।

কীভাবে সে পানিতে নামল সেটা কিন্তু বেশ কৌতূহলের বিষয়। জুলি ডাইভ দিতে জানে না। কিন্তু সে জানে। তা সত্ত্বেও সে কিন্তু তার পা দুটোই রাখে নিচের দিকে, হাত দুটো এমনভাবে আটকে রাখে যেন কোনো দয়ামায়া নেই।

কারণ, যেকোনো দেহভঙ্গির বাস্তব প্রয়োজন ছাড়াও যে কি না এই ভঙ্গি করছে তার ইচ্ছার বাইরেও কিছু অর্থ আছে। যখন কেউ সাঁতারের পোশাক পরে পানিতে নামে তার ভঙ্গির মধ্যে একটা আনন্দ ফুটে ওঠে। এমনও তো হতে পারে, যে সাঁতার কাটছে তার মনটা ভালো নেই। কিন্তু তার ভঙ্গিতে সেটা ফুটে উঠবে না। যখন কেউ সব পোশাক-আশাক পরে পানিতে ঝাঁপ দেয়, তখন কেবল একটা ইঙ্গিতই প্রকাশিত হয়, সে মরতে চায়। যে মারা যেতে চায়, সে কখনো প্রথমে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ডাইভ দেয় না, প্রথমে পা দুটো নামায়। নিজেকে সে পতিত হতে দেয়। এভাবে তা দেহভঙ্গির আবহমান ভাষাকেই প্রকাশ করে। এ কারণেই একজন চমৎকার সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও তার সুন্দরতম পোশাকটি নিয়ে ইমাকুলাতা অত্যন্ত বিশ্রীভাবে পানিতে ঝাঁপ দেয়।

কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়াই ইমাকুলাতা নিজেকে আবিষ্কার করে পানিতে। সেখানে সে এখন দেহভঙ্গির নিয়মের অধীন। এই নিয়ম এখন একটু একটু করে তার আত্মাকে ভরে তুলছে। বুঝতে পারছে সে এখন তার

BanglaBook.org

আত্মহত্যার মধ্যেই বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তার ডুবে যাওয়ার মধ্যে। এখন সে যা করবে তা দেখাবে ব্যালের মতো। সে করে যাবে মূকাভিনয়। তার মধ্য দিয়ে বিয়োগান্ত দেহভঙ্গি তার না-বলা কথা বলে ফেলবে।

তার পতনের পর সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এই জায়গায় পানি বেশি না। তার কোমর পর্যন্ত। এভাবে সে কিছুক্ষণ থাকে। মাথা সোজা। তার ধড় বাঁকা। তারপর আবার সে নিজেকে পড়ে যেতে দেয়। তার মাথা থেকে একটা স্কার্ফ খুলে গিয়ে ভাসতে থাকে। যেমন করে একজন মৃত মানুষের পেছনে ভাসে তার স্মৃতি। সে আবার দাঁড়ায়। তার মাথা পেছনে হেলানো। হাত দুটো প্রসারিত করে সে। সে সামনে কয়েক পা এগোয়। আবার দাঁড়ায়। আবার পানির নিচে যায়। পানি আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে। এভাবে এগোয়। যেন সে একটা রূপকথার হাঁস। একবার পানির নিচে মাথা ডোবাচ্ছে। আবার জাগছে। এই চলা গেয়ে উঠছে ডাঙায় বেঁচে থাকার গান। অথবা পানির গভীরে গিয়ে মরা।

তখন পায়জামা পরা লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে আরম্ভ করে, কেঁদে কেঁদে বলে, 'আমি একটা অপরাধী। আমি একটা অপরাধী। ফিরে এসো। ফিরে এসো।'

৩৯

সুইমিংপুলের অপর প্রান্তে, যে পাশটায় পানি গভীর, চেক বিজ্ঞানী সেখানে বুকডন দিচ্ছিলেন। তিনি সবকিছু দেখছিলেন পরম বিস্ময়ে। আরেকটা জুটিকে আসতে দেখে তিনি ভাবলেন, এরা দুজনেও এসেছে সঙ্গমরত জুটির সঙ্গে যোগ দিতে। রক্ষণশীল কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের বারান্দার নিচে তিনি যে সমস্ত অর্জির কথা শুনে এসেছেন, আজ সুযোগ হবে তা স্বচক্ষে দেখার। ভদ্রতার খাতিরে তিনি এও ভেবে রাখেন যে যদি এরা যৌথ রতিক্রিয়া শুরু করে, তাহলে তিনি জায়গাটা ছেড়ে রুমে চলে যাবেন। তখনই ইমাকুলাতার চিল-চিৎকার তার কান ফাটিয়ে ফেলে, তার হাত

BanglaBook.org

বেঁধে ফেলে। তিনি আর বুকডন দিতে পারেন না, মূর্তির মতো স্থির হয়ে যান, যদিও মাত্র ১৮টি বুকডন দিয়েছেন। তার চোখের সামনেই সাদা পোশাক পরা নারীটি পানিতে পড়ে যায়। তার পেছনে ভাসতে থাকে একটা স্কার্ফ। সঙ্গে ভেসে ওঠে কতগুলো কৃত্রিম ফুল, নীল আর গোলাপি রঙের।

না নড়ে, নিজের ধড়টা তুলে চেক বিজ্ঞানী বুঝতে পারেন, একজন মহিলা পানিতে ডোবার জন্য মাথা নিচু করছে। পানিতে সে মাথা ঠেসে ধরার চেষ্টা করছে, যদিও তার ইচ্ছা খুব প্রবল বলে মনে হচ্ছে না। এই জন্য তার মাথা সোজা হয়ে যাচ্ছে। তিনি একটা আত্মহত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। নারীটি অসুস্থ, অথবা বেদনাহত, অথবা তাড়া খাওয়া, বারবার সে দাঁড়াচ্ছে আবার তার মাথা পানির নিচে ঠেসে ধরছে। সে নিশ্চয়ই সাঁতার জানে না। ধীরে ধীরে সে গভীর পানির দিকে আসছে। এভাবে আসতে থাকলে গভীর পানির নিচে তলিয়ে যাবে। মারা যাবে। একটা পায়জামা পরা লোক হাঁটু মুড়ে মিনতি করছে, কান্নাকাটি করছে, তার নিষ্ক্রিয় চোখের সামনে মেয়েটি মারা যাবে।

চেক বিজ্ঞানী আর অপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি ওঠেন। পুলের কিনারে যান। পা ভাঁজ করেন। হাত পেছনে।

পায়জামা পরা লোকটা দেখে। ৫০ মিটার দূর থেকে। আরে আমাদের দুজনের নাটকের মধ্যে এ আবার কে এল? তার পেশল পেটানো শরীর, আজব ধরনের বেঢপ দেহকাঠামো, সে তো তাদের নাটকের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে। এটা তো তাদের দুজনের ব্যাপার। তার। আর সে যাকে ভালোবাসে তার। এই দুজনের। এর মধ্যে অন্য কেউ এলে সে ঈর্ষাবোধ করবে। কোনোই সন্দেহ নেই সে মেয়েটিকে ভালোবাসে। তার যা ঘৃণা, তা ক্ষণিকের। তার ক্ষমতা নেই যে সে মেয়েটিকে অপছন্দ করে। যদিও মেয়েটি তাকে অনেক কষ্ট দেয়। সে জানে, মেয়েটির এই আচরণের পেছনে আছে তার অযৌক্তিক, শাসন-অযোগ্য স্বৈরাচারী সংবেদনশীলতা। তার অলৌকিক সংবেদনশীলতা, যা ছেলেটি কোনো দিনও বুঝতে পারল না। যাকে সে শ্রদ্ধাই করে। যদিও সে মেয়েটিকে গালিগালাজ করে, কিন্তু সে জানে, মেয়েটি নিষ্পাপ, আর তার এই ধরনের পাগলামোর জন্য অন্য কেউ দায়ী। সে জানে না, সেই তৃতীয় লোকটা কে, সে কোথায় থাকে, যদি

BanglaBook.org

একবার পায়, তাকে সে ছিঁড়ে ফেলবে। যখন সে এসব ভাবছে, একটা লোক মেয়েটির দিকে হেলে পড়ছে, পানির ঠিক কিনারে। পায়জামা পরা লোকটা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেক বিজ্ঞানীর শারীরিক কাঠামোর দিকে তাকায়, শক্ত, মোটা পেশি, শরীরটা বেঢপ, মেয়ে মানুষের মতো মোটা উরু, বুদ্ধিহীন মোটা বাহু, একটা শরীর ঠিক যেন একটা মূর্তিমান অন্যায্য প্রেতাত্মা। লোকটা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে এই লোকের মধ্যে দেখতে পায় তার নিজের কষ্টের প্রতিচ্ছবি, কষ্টের ভেতরে থাকতে থাকতে এই হয় তার। লোকটাকে মনে হয় একটা কদর্যতার সৌধ। সে লোকটার প্রতি সীমাহীন ঘৃণা অনুভব করতে থাকে।

চেক বিজ্ঞানী পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দু-তিনবার হাত-পা চালিয়ে তিনি পৌঁছে যান মেয়েটির কাছে। তখনই পায়জামা পরা লোকটা চিৎকার করে ওঠে, ওকে একা ছেড়ে দাও।

বলেই পরমুহূর্তে সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে।

বিজ্ঞানী মেয়েটির হাত তিনেক দূরে।

তার পা তল খুঁজে পেয়েছে।

পায়জামা পরা লোকটা তার দিকে চিৎকার করছে আর সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে—ওকে ছেড়ে দাও। খবরদার ওকে ছোঁবে না।

চেক বিজ্ঞানী মেয়েটার কোমরে হাত দিয়ে তাকে তুলে ফেলেন। মেয়েটি গভীরভাবে শ্বাস নেয়।

পায়জামা পরা বলে, ওকে ছেড়ে দাও। ওকে পানিতে ফেলে দাও, তা না হলে আমি তোমাকে খুন করব।

পায়জামা পরা লোকটার চোখ ভেসে যায় জলে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সে কিছুই দেখতে পায় না ভালো করে। চেক বিজ্ঞানী মেয়েটাকে ছেড়ে দেয়। দুই লোক দুজনের দিকে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির কথা ভুলে যায়। মেয়েটি সাঁতরে মইয়ের কাছে গিয়ে উঠে পড়ে ডাঙায়।

পায়জামা পরা লোকটা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঘুষি মেরে বসে।

চেক বিজ্ঞানী মুখে একটা ব্যথা অনুভব করেন। জিব দিয়ে অনুভব

BanglaBook.org

করেন একটা দাঁত নড়ছে। সর্বনাশ। এই সেই দাঁত, যেটা প্রাগের একজন দন্তচিকিৎসক তাকে বাঁধিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই দাঁতটার সঙ্গে আরেকটা দাঁত থাকল, এটা যদি কোনো কারণে নড়ে যায়, চিরকালের জন্য তাকে দাঁত হারাতে হবে। এখন এই পেশি দিয়ে তিনি কী করবেন, তার দাঁতই যদি না থাকল। তিনি রেগে যান। তিনি কেঁদে ফেলেন। তার সমস্তটা জীবন সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি অঝোরে কাঁদেন। আজ তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কাঁদছেন। সেই অশ্রু থেকে তার মনে হয়, তার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তার বাহুতে একটা প্রশ্ন স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে, এই পেশি দিয়ে তিনি করবেনটা কী? আর তাতেই তিনি সেটাকে প্রবল বেগে চালনা করেন পায়জামা পরা লোকটার দিকে। প্রচণ্ড এক ঘুষি। তার দাঁত হারানোর তার সমস্ত বেদনার সমান এক ঘুষি। অর্ধশতাব্দীজুড়ে পুরো ফ্রান্সের সমস্ত সুইমিংপুলের ধারে যত বন্য যৌনলীলা হয়েছে, তার সমান একটা ঘুষি। পায়জামা পরা লোকটা মুহূর্তে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিজ্ঞানী ভাবেন, তিনি খুন করেছেন। তিনি একটু পরে তাকে তুলে ফেলেন। তার স্থির মুখে চাপড় দেন। লোকটা তখন চোখ খোলে। তার দৃষ্টি শূন্য। বেঢপ ভূতের দিকে তাকায় সে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সাঁতরে মইয়ের দিকে যায়। মই বেয়ে তার মেয়ে মানুষের কাছে যাবে বলে রওনা হয়।

BanglaBook.org

৪০

পানির ধারে উপুড় হয়ে বসে ইমাকুলাতা চোখ রাখছিল পায়জামা পরা লোকটার ওপরে। তার যুদ্ধ এবং পতন। সে যখন মই বেয়ে পুলের টাইলসের মেঝেতে উঠে পড়ে, ইমাকুলাতা বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওপরের দিকে যেতে থাকে। একবারও পেছনে তাকায় না। কিন্তু সে একটু ধীরেই হাঁটে যাতে পায়জামা পরা তাকে অনুসরণ করতে

পারে। এভাবে দুজনে কোনো কথা না বলে সিক্ত বসনে নির্জন হোটেল লবি ধরে হাঁটতে থাকে নিজেদের রুমের দিকে। তাদের কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে। তাদের শীত লাগে। তাদের অবশ্যই কাপড় পাল্টানো উচিত।

তারপর?

'তারপর' আবার কী? 'তারপর দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

তারা সঙ্গম করবে, আপনার কি তাই মনে হয়? ওই রাতে তারা নীরব থাকবে। শুধু মেয়েটা একটু রোদন করবে। এমন ভাব করবে যেন তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। তারপর সবকিছুই চলতে থাকবে। আজ রাতে তারা যে নাটক করল, কয়েক দিন ধরেই তা করে যেতে থাকবে। কয়েক সপ্তাহ ধরে করবে। মেয়েটা এমন ভাব করবে যেন সে সব ধরনের অশ্লীলতার ঊর্ধ্বে। এই ধরনের গতানুগতিক পৃথিবীকে সে অবজ্ঞা করে। এটা প্রমাণ করার জন্য সে আবারও লোকটাকে তার হাঁটুতে বসতে বাধ্য করবে। লোকটা কান্নাকাটি করবে। নিজেকে দোষ দেবে। মেয়েটা আরো খারাপ হবে। সে তার অসতীপনা প্রদর্শন করবে। তার অবিশ্বস্ততা বেশি করে দেখিয়ে বেড়াবে। লোকটাকে কষ্ট দেবে। লোকটা ঘুরে দাঁড়াবে। যুদ্ধ করবে। সে নিষ্ঠুর হবে, হিংস্র হবে, একটা কিছু করতে চাইবে মেয়েটা যা কোনো দিন ভুলতে পারবে না। একটা ফুলদানি ভেঙে ফেলবে। খুব ঘৃণ্য গালিগালাজ করবে। মেয়েটি ভয় পাওয়ার ভান করবে। বলবে তুমি একটা ধর্ষক। বলবে তুমি একটা হামলাবাজ। লোকটা আবারও হাঁটু মুড়ে বসে ক্ষমা চাইবে। কাঁদবে। বলবে যে নিজেই দোষী। তখন মেয়েটি ছেলেটাকে তার সঙ্গে শুতে দেবে। এটা চলতেই থাকবে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। অনন্তকাল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪১

আর ওই চেক বিজ্ঞানী? তিনি জিভ দিয়ে নড়বড়ে দাঁতটা পরখ করেন। তিনি বলেন, আমার বাকি জীবনে এই থাকল সম্বল। আমাকে এখন দাঁতের বাঁধন পরে থাকতে হবে। কী ভয়ংকর কথা! তিনি আতঙ্কগ্রস্ত। সারাটা জীবন। এই আমার বাকি জীবনের একমাত্র সম্বল। আর কিছু না? একদমই আর কিছু না? না। আর কিছু না। এক মুহূর্তে তার সমস্ত অতীত সামনে ঝলক দিয়ে আসে। একটা মহিমান্বিত অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে নয়। নয় নাটকীয়তায় ভরা তুলনাহীন ঘটনাবলি রূপে। আসে এভাবে যে একটা কণাপরিমাণ সময়খণ্ডের মধ্যে রাজ্যের সব ঘটনা ঢুকিয়ে দিয়ে দলা পাকানো হয়েছে। গ্রহের চারদিকে সেসব প্রদক্ষিণ করছে দ্রুতগতিতে, ফলে সেসব যে কী, ভালো করে উপলব্ধি করতে পারছে না সে। তার মনে হচ্ছে বার্ক ঠিক কথা বলেছিল। তিনি বোধ হয় হ্যাঙ্গেরিয়ান অথবা পোল। আসলে তিনি একজন পোলিশ, কী হাঙ্গেরিয়ান, কী তুর্কি, কী রুশ। নাকি তিনি সোমালিয়ার একজন মুমূর্ষু শিশু। যখন সবকিছু দ্রুত ঘটে যায়, তখন কেউই কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। এমনকি সে তার নিজের সম্পর্কেও ঠিক নিশ্চিত হতে পারে না। আমি যখন মাদাম দে টি কীভাবে রাত কাটান তার বর্ণনা দিই, আমি স্মরণ করি এক্সিসটেনশিয়াল ম্যাথমেটিকস বা অস্তিত্ববাদী গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায়গুলোর একটার প্রথম সমীকরণটা : ভুলে যাওয়ার হার গতির হারের সরাসরি সমানুপাতিক। এই সমীকরণ থেকে আমরা আরো অনেকগুলো অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি। যেমন ধরা যাক, একটা অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে

আমাদের যুগ দেওয়া হয়েছে গতির দৈত্যের হাতে। সেই কারণে এখন নিজেকে ভুলে যাওয়াও সহজ। এখন আমি এই কথাটা উল্টিয়ে বলব, আমাদের যুগ ভুলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বুঁদ হয়ে আছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে গতির দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সে তার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, সে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আর স্মরিত হতে চাই না। এই যুগ নিজেকে নিয়েই ক্লান্ত, নিজেকে নিয়ে রোগাক্রান্ত,

BanglaBook.org

এটা স্মৃতির নিবু নিবু কম্পমান শিখাকে উড়িয়ে দিতে চায় পাগলা হাওয়ায়। ও আমার দেশি ভাই। বন্ধু আমার। হে মুসকা প্রাগেনসিস (Musca Pragensis) নামের মাছির আবিষ্কারক। আমি আর দেখতে চাই না যে তুমি পানিতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছ চিত্রার্পিতের মতো। তোমার ঠান্ডা লাগবে, তুমি মরে যাবে। বন্ধু। ভাই। নিজের ওপর অত্যাচার করা বন্ধ করো। বেরিয়ে এসো। নিজের বিছানায় যাও। সুখী হও যে লোকে তোমাকে ভুলে গেছে। বিস্মৃতির বিশ্বচাদরের নিচে ঢুকে আরামে থাকো। ভুলে যাও কে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে তোমার দিল জখম করেছে। ওই উপহাস আর পৃথিবীতে বিরাজ করে না। তোমার সেই নির্মাণশ্রমিকের দিনগুলোরও আর অস্তিত্ব নেই। তোমার একটা শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষ হওয়ার গৌরবের দিনও আর নেই। হোটেলভবন এখন নীরব। জানালা খুলে দাও। গাছের গন্ধে ভরে উঠুক রুম। শ্বাস নাও। ওই গাছগুলো হচ্ছে তিন শ বছরের পুরোনো চেস্টনাট। মাদাম দে টি এবং শেভালিয়ে যখন চালাঘরে কামলীলায় মত্ত ছিলেন, তখন এই গাছের পাতার মর্মর শুনছিলেন। এই জানালা থেকে তা দেখা যেত। তবে দুঃখের বিষয়, তুমি ওই চালাঘরটা দেখতে পাবে না। ঘটনার পনেরো বছর পরে সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। ১৭৮৯-এর বিদ্রোহের সময়। যা রয়ে গেছে তা হলো ভিভাঁ দেনোঁর কয়েকটা পৃষ্ঠা, যা তুমি কোনো দিন পড়োনি, আর সম্ভবত, কোনো দিন পড়বেও না।

৪২

ভিনসেন্ট তার আন্ডারওয়্যার খুঁজে পায় না। ভেজা শরীরের ওপর প্যান্ট-শার্ট চাপিয়ে জুলির পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে সে। কিন্তু জুলি বেশি দ্রুত। আর ভিনসেন্ট বেশ ধীর। সে যখন দৌড়ে করিডর পেরোল, ততক্ষণে জুলি হাওয়া। ভিনসেন্ট তো জানে না জুলির রুম নম্বর কত। সে ভাবে, আজ তার চান্স কম। সে তখন হোটেলের রুমগুলোর সামনে করিডর দিয়ে হাঁটে, আশা করে হয়তো একটা দরজা খুলে যাবে, জুলি তাকে ডাকবে,

BanglaBook.org

এসো ভিনসেন্ট এসো। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল নীরবতা শাসন করছে করিডর। সব দরজা বন্ধ। কেউ তাকে ডাকে না। সে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে, জুলি জুলি। না। কোথাও কেউ নেই। সে আরেকটু জোরে ডাকে, জুলি জুলি। নীরবতাই কেবল ফিরে আসে। সে তাকে কল্পনার চোখে দেখে। কল্পনায় সে দেখে চাঁদের মতো স্বচ্ছ একটা মুখ। সে তার পায়ুপথ কল্পনা করে। আহা। তার পায়ুপথ। কত কাছে ছিল সেটা তার। তখন তো সেটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কেমনে সে পারল মেয়েটার গুহ্যদ্বার না দেখে, না স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার জিনিসটা জেগে ওঠে, জেগে ওঠে, দাঁড়িয়ে পড়ে, কাজ ছাড়াই, মানে ছাড়াই, বিশালভাবে।

সে তার রুমে ফেরে। একটা চেয়ারে বসে পড়ে ধপাস করে। তার মাথায় এখন আর কিছুই নাই। জুলির জন্য প্রচণ্ড কামনা ছাড়া। সে তাকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার যেকোনো কিছুই করতে পারে। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। কাল সকালে নিশ্চয়ই নাশতার টেবিলে জুলি আসবে। কিন্তু ততক্ষণে তাকে ফিরে যেতে হবে প্যারিসে, নিজের অফিসে। সে তার ঠিকানা জানে না, তার লাস্ট নেম জানে না, মেয়েটা কোথায় কাজ করে জানে না। সে এখন একা। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে একা। আর তার সঙ্গী তার বিরাট শক্ত হয়ে যাওয়া জিনিসটা।

এক ঘণ্টা আগেও ভিনসেন্টের এই অঙ্গটার আচার-ব্যবহার ছিল প্রশংসাযোগ্য। আকার ছিল ভদ্র মাপের। তার একটা চমৎকার ভাষণে সবাই মুগ্ধও হয়েছিলাম। জেনেছিলাম কেন সে তখন নিজের আকার সীমায়িত রেখেছিল। কিন্তু এখন তো আমাদের সন্দেহ করতে হচ্ছে তার সুবিবেচনা সম্পর্কে। এই মুহূর্তে সেই একই অঙ্গ তার সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। অকারণেই সে রুখে দাঁড়িয়েছে, বিটোফেনের নবম সিম্ফনির মতো, এই বিষণ্ন মানবজাতির মুখের ওপরে যে তার আনন্দপূর্ণ সুর নিয়ে গর্জে উঠছে।

BanglaBook.org

৪৩

ভেরা জাগল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো।

'কেন তুমি কান-ফাটানো আওয়াজে রেডিও বাজাচ্ছ? তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তো!'

'আমি তো কোনো রেডিও বাজাচ্ছি না। এখন তো সব চুপচাপ। যেকোনো জায়গার তুলনায় জায়গাটা নীরব।'

'না। তুমি রেডিও বাজাচ্ছিলে। বেশ আজব ব্যাপার। আমি ঘুমাচ্ছিলাম।'

'আমি কসম কেটে বলছি।'

'তুমি শুনছিলে সেই আনন্দের তীব্র উচ্চকিত সুর।'

'আমাকে আবার ক্ষমা করে দাও। এটা আমার কল্পনার দোষ।'

'কী বলতে চাও? তোমার কল্পনা? তুমি ৯ নম্বর সিম্ফনির স্রষ্টা নাকি? তুমি কি নিজেকে এখন বিটোফেন ভাবা শুরু করে দিয়েছ?'

'না। আমি কিন্তু তা বলতে চাইনি।'

'ওই সিম্ফনিটা আজ আমার লাগল অসহ্য। মানে কেমন যেন খাপছাড়া, বাচ্চামোয় ভরা, চেঁচামেচিতে ভরা, বেশি চড়া, অশ্লীল। অন্য সময় তো তা মনে হয়নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এটা আমি সহ্যই করতে পারছি না। এটা নিশ্চয়ই বাগানবাড়ি হোটেলের সমস্যা। এই বাড়িটা ভূতের বাড়ি। এইখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি না। আমাকে যেকোনো একটা জায়গায় নিয়ে চলো। সূর্য উঠছে।'

ভেরা বিছানা ছাড়ল।

BanglaBook.org

৪৪

এখন ভোর। আমি ভাবছি ভিভাঁ দেনোঁর উপন্যাসিকার শেষ দৃশ্যের কথা। প্রাসাদের গোপন কক্ষে গোপন ভালোবাসার রাতটির অবসান ঘটে যায়।

এসে পড়ে একজন পরিচারিকা, গোপন সংবাদবাহিকা। বলে, দিন আসছে। নিশি অবসান। শেভালিয়ে দ্রুত কাপড় পরে নেয়। কক্ষত্যাগ করে। কিন্তু প্রাসাদের অন্ধিসন্ধিতে পথ হারিয়ে ফেলে। কেউ তাকে দেখে ফেলবে, এই ভয়ে সে চলে যায় বাগানে। সেখানে সারা রাত আরামে ঘুমানো একজন ভোরের ভ্রমণকারীর মতো করে হাঁটে। তার মাথা তখনো চক্কর দিচ্ছে। সে ভাবতে থাকে, হিসাব কষতে থাকে, এই রাতের অভিসারের মানেটা কী! মাদাম দে টি কি তার প্রেমিক মার্কিসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে ফেলেছেন? নাকি তিনি ছাড়াছাড়ির প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন? কিংবা তিনি কেবল মার্কিসকে শাস্তি দিতে চাইছেন? এই রাতের পর আর কী কী ঘটতে পারে?

এই সব প্রশ্নের ভেতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শেভালিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে তার সামনে মাদামের প্রেমিক মার্কিস দাঁড়িয়ে। তিনি কেবলই এসেছেন, দ্রুত আসেন শেভালিয়ের সামনে, তাকে বলেন, সারা রাত কাটল কেমন?

এইবার যে সংলাপগুলো হবে, তা থেকে শেভালিয়ে জানতে পারবে, মাদামের স্বামীর দৃষ্টি সরিয়ে অন্যত্র নেবার জন্যই এই আয়োজন করা হয়েছিল। একটা ভুয়া প্রেমিকের দরকার ছিল। শেভালিয়ে সেই নকল প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করল। ছোটখাটো ভূমিকা নয়। বেশ বড় ভূমিকা। কিন্তু আজব ভূমিকা। মার্কিস স্বীকার করেন। শেভালিয়ের এই আত্মদানের প্রতিদানস্বরূপ মার্কিস তাকে কতগুলো গোপন কথা জানান, মাদাম একজন পূজনীয় নারী, তার বিশ্বস্ততার কোনো তুলনা হয় না, একটাই তার অসুবিধা, তিনি কামশীতল।

দুই লোক প্রাসাদে ফিরে আসে, মাদামের স্বামীর সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানায়। মার্কিসকে স্বামী শ্রদ্ধার সঙ্গেই নেন, কিন্তু শেভালিয়ের প্রতি তার অপছন্দ গোপন করেন না। তাকে বলেন, সে যেন যত তাড়াতাড়ি পারে, বিদায় নেয়। মার্কিস তাকে নিজের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়।

তারপর মার্কিস আর শেভালিয়ে যায় মাদামের কাছে। কথাবার্তার শেষে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শেভালিয়েকে কতগুলো প্রেমপূর্ণ কথা বলেন মাদাম। এই ছিল তাদের শেষ কথা, যা এই উপন্যাসিকায় লেখা আছে 'এখন

BanglaBook.org

তোমার ভালোবাসা তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার ভালোবাসার মানুষটি এই ভালোবাসার যোগ্য। বিদায়। আবারও। তুমি দারুণ। তোমার প্রেমিকাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়ো না।'

'তোমার প্রেমিকাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়ো না।' এই ছিল মাদাম দে টির শেষ কথা।

এই সংলাপের শেষে শেভালিয়ে তার জন্য অপেক্ষমাণ ঘোড়ার গাড়িতে ওঠে। উপন্যাসিকার শেষ লাইনগুলো এ রকম : 'অপেক্ষমাণ গাড়িতে আমি আরোহণ করলাম। এই পুরো অভিসারটার উপদেশ কী, সেই জিজ্ঞাসা আমাকে তাড়িত করছে। আমি কিছুই পেলাম না।'

তারপরও এই গল্পের উপদেশ হলো 'মাদাম টি এটা তৈরি করেছেন। তিনি তার স্বামীকে মিথ্যা বলেছেন। তিনি তার প্রেমিক মার্কিসকে মিথ্যা বলেছেন। তিনি তরুণ শেভালিয়েকে মিথ্যা বলেছেন। তিনি হলেন এপিকিউরাসের আসল শিষ্য। তিনি আনন্দ-ফুর্তির প্রেমযোগ্য প্রেমিক। ভদ্র রক্ষক মিথ্যুক। সুখের অভিভাবক।'

৪৫

উপন্যাসিকাটি উত্তম পুরুষে বলা। কথক শেভালিয়ে। তার পক্ষে বলা সম্ভব না আসলে মাদাম টি কী ভেবেছেন। সে নিজের ব্যাপারেও মিতব্যয়ী। নিজে কী ভাবছে, কী অনুভব করছে, তা-ও সে কমই বলে। এই দুই চরিত্রের মনের ভেতরের জগৎটা আমরা জানি না, আবৃতই থাকে, কিংবা থাকে অর্ধ-আবৃত।

যখন, সকালবেলা, মার্কিস বলছিল যে মাদাম কামশীতল, তখন শেভালিয়ে হেসে পেট ফাটিয়ে ফেলতে পারত, কারণ একটু আগেই তার সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই একটা ব্যাপারেই শেভালিয়ে নিশ্চিতভাবে জানে। বাকি কিছুই জানে না। শেভালিয়ের সঙ্গে কামলীলায় মাদাম যে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন, সেটা কি তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকবারই করেন,

BanglaBook.org

নাকি শুধুই এই একটা রাতে তিনি এমনটা করলেন। তার হৃদয় কি গলে গিয়েছিল নাকি তা এখনো অখণ্ডই আছে? তিনি কি ভালোবাসার রাতটিতে শেভালিয়ের প্রেমিকার কথা ভেবে ঈর্ষা অনুভব করছিলেন? তিনি যে শেষ কথাটি বললেন শেভালিয়েকে, তার প্রেমিকা সম্পর্কে, এটা কি একটা সৎ পরামর্শ, নাকি এটা ছিল নিরাপত্তা বিষয়ে তার উদ্বেগের কথা? শেভালিয়ে যখন থাকবে না, তিনি কি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন, উদাস হবেন তার কথা ভেবে?

আর তার নিজের মনেই-বা কী ঘটছিল। যখন সকালবেলা তার সামনে মার্কিস এসে হাজির হলো, সে কথাবার্তার জবাব ভালোই দিতে পেরেছিল। বুদ্ধিদীপ্তভাবেই কথা চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে সে নিজে কী অনুভব করছিল? যখন সে বাগানবাড়ির প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তার মনে তখন কী ভাবের উদয় ঘটেছিল? সে কী ভাবছিল? তার কি মনে পড়ছিল রাতভর যে পুলক সে লাভ করেছিল, তার কথা? নাকি তাকে যে হাস্যকরভাবে ব্যবহার করা হলো সেটা? সে কি সুখী ছিল না অসুখী?

অন্যভাবে বললে এটা কি সম্ভব যে আপনি বাস করবেন ফুর্তির মধ্যে, তারপর আরো ফুর্তি, তারপরও আপনি সুখী থাকবেন? ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণবাদের ধারণা কি আসলে আছে? আশা আছে? অথবা আশার কোনো রেশ আছে?

৪৬

উফ। এমন ক্লান্তি, মরার ক্লান্তি। তার ইচ্ছে হচ্ছে এখনি একটা বিছানায় হাত-পা মেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমায়। কিন্তু তাকে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। এখন ঘুমালে আর সময়মতো উঠতে পারবে না। সে চেয়ারে বসে। এক লাফে মাথায় মোটরসাইকেল-হেলমেট পরে নেয়। এতে করে যদি তার চোখের ঘুম চলে যায়। কিন্তু মাথায় হেলমেট থাকা অবস্থায় বসে থাকলে ঘুম আসবে না, তা না-ও হতে পারে। সে

BanglaBook.org

দাঁড়ায়। সিদ্ধান্ত নেয়, সে চলে যাবে।

আসন্ন প্রস্থান তাকে পঁতেভিঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আহ, পঁতেভিঁ। পঁতেভিঁ তো তাকে জেরা করবেন। কী বলবে তাকে? যা যা ঘটেছে সবই যদি তাকে বলে, তিনি খুবই মজা পাবেন। অন্যরাও মজা পাবে। গল্পের কথক যখন গল্পে মজার ভূমিকা নেয়, সবাই সে গল্প পছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই কাজটা সবচেয়ে ভালো পারেন পঁতেভিঁ। ধরা যাক তিনি যখন টাইপিস্ট মেয়েটাকে ধরে বিছানায় ছুড়ে ফেলার গল্পটা করেন, তখন কিন্তু তিনি যে ভুল করেছিলেন তা বলেন, তিনি অন্য মেয়েকে ভেবে এই মেয়েকে টানছিলেন। কিন্তু পঁতেভিঁ আসলে ধূর্ত। সবাই জানে, তার হাসির গল্প একটা ছদ্মবেশ। তিনি আসলে একটা চাটুকারিতা ঢাকতে চাইছেন। শ্রোতারা তাকে ঈর্ষা করবে কারণ তার বান্ধবী চায় যে তিনি তার সঙ্গে কর্কশ আচরণ করুন। সবাই কল্পনা করবে টাইপিস্ট মেয়েটা খুব সুন্দর। ঈর্ষা হবে। কিন্তু যখন ভিনসেন্ট তার নিজের গল্পটা বলবে, সুইমিংপুলের ধারে সে কীভাবে রতিক্রিয়া করছিল, সবাই সেটাকে সত্য বলে ধরে নেবে আর হাসতে থাকবে। তাকে উপহাসই করবে। উপহাস করবে তার ব্যর্থতাকে।

সে তার রুমে পায়চারি করে। গল্পটা নতুনভাবে সাজায়। তাকে কিছু কিছু বদল ঘটাতে হবে। সুইমিংপুলের ধারে তাদের নকল রতিক্রিয়াকে সত্যিকারের রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করতে হবে। সে কল্পনা করতে থাকে চারদিক থেকে লোকেরা আসছে। তারা বিস্মিত। দুজন নারী-পুরুষ দ্রুত আলিঙ্গন করছে, কাপড় খুলছে। তাদের কেউ দেখছে। কেউ তাদের মতো করার চেষ্টা করছে। চারদিকে অনেক জুটি রমণ করতে শুরু করেছে। এই সময় এই দুজন পাকা মঞ্চাভিনেতার মতো দাঁড়াল। চারদিকে মিথুনরত জুটিদের দেখল। তারপর চলে গেল। যেমন দেবদেবীরা জগৎটাকে সৃষ্টি করে চলে গেছেন। তারা দুজনে যেমন কেউ কাউকে চিনত না, তেমনি করে চলে গেল, যাদের আর কোনো দিন দেখা হবে না।

আর কোনো দিন দেখা হবে না কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গ আবারও খাড়া হতে শুরু করল। এবার তার দেয়ালে মাথা ঠোকার দশা।

এখানেই কিন্তু এই কৌতূহলের বিষয়টা নিহিত। যখন ভিনসেন্ট কল্পনা

BanglaBook.org

করছিল তাদের চারদিকে অর্জি হচ্ছে, তখন কিন্তু তার অঙ্গ চুপচাপই ছিল। যেই বাস্তবে জুলির অনুপস্থিতির কথা ভাবতে শুরু করল, অমনি তার কামভাব জেগে উঠল।

এখন তার কামভাব কমানোর একটাই উপায়। এই সম্মিলিত রতিমেলার দৃশ্যটা আবারও কল্পনা করা। তাদের চারপাশে অনেক যুগল। তারা তাদের দুজনকে দেখে কাপড় খুলছে। জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হচ্ছে। এভাবে একই দৃশ্য সে কয়েকবার কল্পনা করল। তখন তার শরীরটা একটু ঠান্ডা হলো। তার অঙ্গ শান্ত হয়ে এল।

সে ক্যাফে গ্যাসকোঁর কথা ভাবে। তার সতীর্থরা সবাই তার কথা শুনছে। পঁতেভিঁ আর মাচু তাদের আহাম্মকসুলভ হাসি হাসছেন। গুজা তার মন্তব্য ছুড়ছে বিজ্ঞের মতো। অন্যরাও। সে বলে চলেছে, 'আমি তোমাদের হয়ে সঙ্গম করেছি, তোমাদের সবার নুনু আমার নুনুর সঙ্গে ছিল। ওই জাঁকাল অর্জিতে। আমি তোমাদের হয়ে প্রক্সি দিয়েছি। আমি তোমাদের প্রতিনিধি ছিলাম ওখানে। আমি ছিলাম তোমাদের ডেপুটি ফাকার, তোমাদের নুনু, আমি ছিলাম একটা নুনুসমষ্টি।'

সে পুরো রুমে চক্কর মারে আর শেষের কথাগুলো বলতে থাকে বারবার। নুনুসমষ্টি। কী সুন্দর কথা সে আবিষ্কার করল। তারপর, তার অনিচ্ছায় খাড়া হওয়া অঙ্গ সম্পূর্ণ নেমে গেলে সে ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

৪৭

ভেরা বিল শোধ করার জন্য হোটেলের কাউন্টার ডেস্কে গেছে। আর আমি আমাদের ছোট্ট ট্রাভেল ব্যাগটা গাড়ির কাছে নিয়ে যাই, বাইরের চত্বরে। আমার স্ত্রীর ঘুম আমি নষ্ট করেছিলাম নবম সিম্ফনি দিয়ে। এটা ভেবে একটু দুঃখ হলো। এ জন্যই আমাদের এই সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমি এখানে খুব ভালো ছিলাম। চারপাশটা একবার দেখে নিই। সামনের সিঁড়ির দিকে তাকাই। এখানেই মাদামের স্বামী তার স্ত্রী এবং

BanglaBook.org

তরুণ শেভালিয়েকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্র কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিক্ত মুখ নিয়ে। তখন সন্ধ্যা নামছে। ঘোড়ার গাড়িতে করে ওই দুজন এল থিয়েটার থেকে। আরো দশ ঘণ্টা পরে এই জায়গায় যখন শেভালিয়ে আসে, তখন তার সঙ্গে কেউ নেই।

মাদাম দে টির দরজা যখন তার পেছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সে শুনতে পেল মার্কিসের হাসির শব্দ। তার সঙ্গে একটা নারীকণ্ঠের হাসি যোগ হলো। কিছুক্ষণের জন্য সে চলার গতি ধীর করে ফেলল। তারা হাসছে কেন? তারা কি তাকে নিয়ে রসিকতা করছে? তারপর সে আর কিছু শুনতে চায় না। সোজা বাইরে চলে যায়। কিন্তু তার আত্মার ভেতরে সেই হাসি বাজতেই লাগল, সে তাকে পারে না এড়াতে। তার মনে পড়তে থাকে মার্কিসের সেই মন্তব্য 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তোমার ভূমিকা কী রকম হাস্যকর?' এই ধরনের একটা অবমাননাকর প্রশ্ন যখন মার্কিস তাকে করেছিল, সে কিন্তু চোখের পাতা পিটপিট করেনি। তার মনে হচ্ছিল, মার্কিস অন্যদের সেক্স দেখে আনন্দ পাচ্ছে। অথবা সে নিজেকে বলছিল, মাদাম অবশ্যই মার্কিসকে ছেড়ে দেবেন আর তাদের আবারও দেখা হবে। মাদাম আসলে মার্কিসের ওপরে কোনো একটা প্রতিশোধ নিচ্ছেন। কাজেই মাদামের সঙ্গে শেভালিয়ের দেখা হবেই। কারণ আজ যিনি শোধ নিচ্ছেন, আগামীকালও তিনি শোধ নেবেন। কিন্তু মাদামের শেষ কথার পরে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, এই রাতের পরের পর্ব আর আসবে না। আর কোনো আগামীকাল নেই।

সে ওই প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসে সকালের শীতল শূন্যতার মধ্যে। তার মনে হতে থাকে, কাল রাতের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, কিছুই তার সঙ্গে যাচ্ছে না, যাচ্ছে শুধু সেই বিদ্রূপের হাসিটুকুন। এসব নিয়ে তারা গালগল্প করবে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, সে হবে একটা উপহাসের পাত্র। এটা ঠিক যে কোনো মেয়েমানুষ সেই লোককে চায় না যে একটা ঠাট্টার পাত্র। তারা তাকে ছুটি দেয়নি, তারা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে ক্লাউনের টুপি। এই টুপি সে বয়ে বেড়াতে চায় না। তার ভেতরে একটা বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে। বলে, এই কাহিনিটা বলে ফেলো, যেভাবে ঘটেছে সেভাবে বলবে। খোলাখুলিভাবে বলো। সবাই শুনুক।

BanglaBook.org

সে জানে সে এটা করতে পারবে না। হাসির পাত্র হওয়ার চেয়ে দুর্বিনীত হওয়া খারাপ। সে মাদাম দে টির সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে না, করবে না।

৪৮

হোটেলের রিসেপশনের কাছের আরেকটা দরজা দিয়ে ভিনসেন্টও বাইরের চত্বরে আসে। সে বারবার করে নিজের মনে বলতে থাকে সুইমিংপুলের সামনে গণরতিক্রিয়ার গল্পটা। এবার আর নিজের কামভাব ঠান্ডা করার জন্য না। তার শরীর এরই মধ্যে ঠান্ডা মেরে গেছে। বরং সে জুলিকে হারানোর তীব্র বেদনা ভুলতে চাইছে। সে জানে, কেবল বানানো গল্প তাকে ভুলিয়ে দিতে পারে আসলে কী ঘটেছে। বানানো গল্পটা সে সবার সামনে প্রকাশ্যে এবং তাড়াতাড়ি বলতে চায়, একটা অনুষ্ঠান করে, ঘটা করে, মজা করে, যা তার ভেতরের স্মৃতির যন্ত্রণা মুছে দিতে সাহায্য করবে। সেই স্মৃতি, তার নকল সঙ্গম, যার ফলে জুলিকে সে হারিয়েছে।

সে তার গল্প বলার মহড়া দেয়। আমি ছিলাম একটা নুনুসমষ্টি। উত্তরে সে শুনতে পায় পঁতেভিঁর ষড়যন্ত্রময় হাসি। সে দেখতে পায় মাচুর সেই আবেদনময় হাসি। সে বলবে, 'তুমি একটা নুনুসমষ্টি। আমরা তোমাকে এখন থেকে নুনুসমষ্টি নামেই ডাকব।' সে ভাবনাটাকে পছন্দ করে এবং হাসে।

সে পার্কিংয়ের দিকে যায়। সেখানে তার মোটরসাইকেল একটা প্রান্তে রাখা। সেখানে সে দেখতে পায় বহু অতীতের পোশাক পরা তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একজনকে। তরুণটি তার দিকেই আসছে। ভিনসেন্ট তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন তার সমস্ত চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। সে কী দেখছে? মনে হয় সারা রাত জেগে থাকা আর রাতের ধকলের কারণে সে এই রকম ভৌতিক জিনিস দেখছে। এ ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে। হতে পারে, লোকটা একজন অভিনেতা, তার নাটকের

BanglaBook.org

ঐতিহাসিক চরিত্রের পোশাক পরে সে বাইরে এসেছে। হতে পারে, টেলিভিশনের ওই মহিলাটার কেউ হবে সে। হতে পারে, এই ঐতিহাসিক প্রাসাদে কেউ একটা বিজ্ঞাপনী ছবির শুটিং করছে। তরুণের চোখে চোখ পড়ল ভিনসেন্টের। তার চোখেও বিস্ময়। কোনো অভিনেতার পক্ষেই এই বিস্ময় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব না।

৪৯

তরুণ শেভালিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকায়। মাথার ওপরে কী একটা পরেছে সে, সেটাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিন বা চার শতাব্দী আগে, শেভালিয়েদের এই রকমের হেলমেট পরে যুদ্ধে যেতে হতো। কোনোই সন্দেহ নেই, এই হেলমেট প্রমাণ করছে লোকটা অভিজাত নয়। আর তার ট্রাউজারটাও কেমন বেখাপ্পা। হতে পারে সে একটা কৃষক। বা ভিক্ষু।

তার নিজেকে ক্লান্ত লাগে, শক্তিহীন লাগে, অসুস্থ লাগে। সম্ভবত সে ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখছে, সম্ভবত সে ঘুমরোগে আক্রান্ত। শেষ পর্যন্ত লোকটা তার সামনে আসে, ভিনসেন্ট মুখ খোলে, বলে, 'তুমি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এসেছ?'

শেভালিয়ের মনে হয় এই প্রশ্ন অদ্ভুত, অবাস্তব। কিন্তু লোকটা যেভাবে প্রশ্নটা করল, তা আরো অদ্ভুত। মনে হচ্ছে, সে ভিনদেশের সংবাদবাহক। ফ্রান্স সম্পর্কে তার ধারণা নেই, হয়তো সে আদালত থেকে ফরাসি শিখে নিয়েছে। এই অদ্ভুত উচ্চারণ, কথার সুর, এসব থেকে শেভালিয়ের মনে হতে লাগল, লোকটা বোধ হয় অন্য কোনো সময়পর্ব থেকে এসেছে।

'হ্যাঁ। আর তুমি?'

'আমি? আমি বিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আমি এইমাত্র একটা চমৎকার রাত কাটিয়েছি।'

শেভালিয়ে বলল, 'আমিও একটা চমৎকার রাত কাটিয়েছি।' সে মাদাম

BanglaBook.org

দে টির ছবি কল্পনা করল। হে খোদা, আমি কী করে এতক্ষণ মার্কিসের হাসিঠাট্টাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছিলাম। কী করে আমি পারলাম, মাদামের সৌন্দর্যের কথা না ভেবে থাকতে, যে সৌন্দর্য এমনভাবে গ্রস্ত করে রেখেছে যে সে এখন উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ভূত দেখছে। বাস্তবতা আর মায়া মিলেমিশে যাচ্ছে। সে সময়ের বাইরে চলে যাচ্ছে।

হেলমেট হাতে লোকটা তার অদ্ভুত উচ্চারণে বলে যেতে থাকে, 'আমি একটা সাংঘাতিক রাত কাটালাম।'

শেভালিয়ে মাথা নাড়ে। সে ভাবে যে সে বলবে, আমার মতো তা কে আর ভালো জানে! কিন্তু নিজেকে সে নিবৃত্ত করে। তার রাতের অভিজ্ঞতার কথা সে কাউকে বলবে না। কিন্তু গোপনীয়তার শর্ত কি দুই শ বছর ধরে বলবৎ থাকবে? সে মনে করে, চিন্তার মুক্তির দেবতা এই লোককে তার সামনে পাঠিয়েছেন, যাতে করে সে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে। কাজেই সে যে গোপনীয়তার শপথ করেছে, তা বজায় রেখেও এই লোকের সামনে সে অগোপনভাবে কথা বলতে পারে। যাতে করে সে তার জীবনের মুহূর্তটিকে ভবিষ্যতে স্থাপন করতে পারে। এটাকে অবিনশ্বর করতে পারে। এটাকে এক গৌরবময় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

'আসলেই কি তুমি বিংশ শতাব্দী থেকে এসেছ?'

'আমি অবশ্যই এসেছি। পুরোনো আমলের লোক। এই শতাব্দীতে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে চলেছে। নৈতিকতার মুক্তি ঘটে গেছে। আমি একটু আগে একটা সাংঘাতিক রাত কাটিয়ে এলাম।'

'আমিও তো তা-ই করে এলাম।' সে তাকে আবার বলে। তারপর ঠিক করে যে পুরো ঘটনা এই লোকটাকে বলবে।

'অদ্ভুত এক রাত। খুবই আজব। অসম্ভব।' হেলমেট হাতে লোকটা বলে চলে। সে যেন জোর করেই তার কাহিনি বলতে চাইছে।

শেভালিয়ে দেখতে পায় এই লোকটা বেশ একটা গোঁয়ার টাইপের। সে শুধু নিজের কথা বলতে চায়। তার মানে অন্যের কথা শোনার ধৈর্য তার নেই। যে শুধু বলতে চায়, শুনতে চায় না, তার সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে শেভালিয়ে। এর সঙ্গে এই মোলাকাতের আর কোনো মানে হয় না।

BanglaBook.org

শেভালিয়ে আবারও ক্লান্তি বোধ করে। সে তার মুখের কাছে হাত আনে। আহা। রাতের বেলাকার মাদামের গায়ের গন্ধ এখনো হাতে লেগে আছে। তাকে স্মৃতিকাতরতা আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে এখন একা উঠতে চায় ঘোড়ার গাড়িতে। এবং মাদামের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে একা যেতে চায় প্যারিসে।

৫০

ভিনসেন্টের তুলনায় তরুণটার বয়স কম, বেশভূষা অনেক কাল আগের। অল্প বয়সী একটা ছেলের তো উচিত তার চেয়ে বয়স্ক একজন মানুষের স্বীকারোক্তি মন দিয়ে শোনা। ভিনসেন্ট দুবার বলল, 'আমি খুব চমৎকার রাত কাটিয়েছি।' জবাবে সে বলল, 'আমিও।' ছেলেটা তার কথা শুনতে চাইবে না? না। উল্টো তার চোখমুখ থেকে আগ্রহ নিভে গেল দপ করে। সে উদাসীনতা দেখাল। একেবারে বেয়াদবের মতো। তাদের মধ্যে যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ছিল, যাকে বিশ্বাস করা যায়, তা মুহূর্তেই উবে গেল।

এই তরুণের পোশাক দেখে সে বিরক্ত। কে এই ক্লাউন? জুতার মধ্যে রুপার আংটা। পায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে চিপা পায়জামা। পাছার সাথে। কী সব পরেছে, ভেলভেট, লেস, গলার কাছে কী ঝুলছে, কাপড়ের ওপরে কী একটা ঢাকনা, বুকের ওপরেই-বা কী! ভিনসেন্ট দুইটা আঙুল দিয়ে তরুণটির গলার কাছে ফিতার বাঁধনটা টিপে টিপে হাসিভরা তাচ্ছিল্য দেখায়।

পুরোনো দিনের পোশাক পরা ছেলেটা ভিনসেন্টের তাচ্ছিল্য বুঝতে পারে। সে খেপে যায়। তার চোয়াল শক্ত হয়, চোখেমুখে ফুটে ওঠে ঘৃণা। সে তার ডান হাত তুলে ভিনসেন্টকে চড় মারতে চায়। ভিনসেন্ট হাত সরিয়ে নেয়। এক পা পেছনে চলে আসে। শেভালিয়ে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

তার এই ঘৃণার থুতু ভিনসেন্টকে আবার বর্তমানে ফিরিয়ে আনে।

BanglaBook.org

নিজেকে দুর্বল লাগে তার। সে জানে, তার অর্জির গল্প কাউকে সে বলবে না। মিথ্যা বলার মতো শক্তি তার নেই। এখন তার একটাই চাওয়া, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কালকের রাতটাকে ভুলে যাওয়া। এই বিপর্যয়ের রাত। দুর্যোগের রাত। এটাকে চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে। শূন্য করে ফেলতে হবে। এ মুহূর্তে তার দরকার গতি। গতির দুর্মর তৃষ্ণায় সে এখন তাড়িত বোধ করে।

সে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যায় তার মোটরসাইকেলের দিকে। এখন সে মোটরসাইকেলের প্রতি তার ভালোবাসা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই মোটরসাইকেল। তাকে দেবে গতি। তাকে ভুলিয়ে দেবে সব। ভুলিয়ে দেবে তার নিজেকেই।

৫১

ভেরা আমার পাশে গাড়িতে এসে বসে।

'ওই দিকে দেখো।' আমি তাকে বলি।

'কোন দিকে?'

'ওই দিকে। ওই যে ভিনসেন্ট যাচ্ছে। তুমি তাকে চিনতে পারছ না?'

'মোটরসাইকেলে চড়া লোকটার নাম ভিনসেন্ট?'

'হ্যাঁ। আমার ভয় হচ্ছে সে খুব জোরে মোটরসাইকেল চালাবে। আমার সত্যি ভয় হচ্ছে।'

'সে কি জোরে চালাতে পছন্দ করে? সে জোরে চালায়?'

'সব সময় না। কিন্তু আজ সে পাগলের মতো চালাবে।'

'এই বাগানবাড়িটা ভূতের বাড়ি। এই বাড়ি সবার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে। প্লিজ, তুমি গাড়ি স্টার্ট দাও।'

'একটা সেকেন্ড।'

আমি আমার শেভালিয়েকে একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে দেখতে চাই। সে ঘোড়ার গাড়ির দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে। আমি তার চলার ছন্দটুকু

BanglaBook.org

উপভোগ করতে চাই। সে যতই গাড়ির নিকটবর্তী হচ্ছে ততই চলার গতি কমিয়ে দিচ্ছে। ধীরে চলা, এই ধীরে চলার মধ্য দিয়েই আমি সুখের চিহ্নটাকে চিনে নিতে চাই।

কোচোয়ান তাকে অভ্যর্থনা জানায়। সে থামে। সে তার আঙুল আনে নাকের কাছে। তারপর পা বাড়িয়ে কোচে ওঠে। তার আসনে বসে। এক পাশে সরে হেলান দেয়। পা দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করে। শিগগিরই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তারপর সে জাগবে। তখন সে সারাক্ষণ চেষ্টা করবে ওই রাত্রিটির কাছাকাছি থাকতে, যতটা

প্রিয় পাঠক, উপন্যাসের শেষের দিকে এসে আমি আর কোনো টীকা-টিপ্পনী দিইনি। কারণ গল্পটা ততক্ষণে গতি পেয়ে গেছে। আমরা দেখলাম, মিলান কুন্ডেরা কতগুলো কাজ করেছেন, যাকে আমরা বলতে পারি, জাদুবাস্তবতা, কিংবা অ্যাবসার্ড কিংবা সুররিয়াল বা ফ্যান্টাসি। পুরো গল্পটা তিনি ভাবছেন। তার ভাবনা স্বপ্নে দেখছেন ভেরা, তার স্ত্রী। গল্পের শেষে তিনি তিন পক্ষকে একখানে করে ফেললেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেভালিয়ে, বিংশ শতাব্দীর ভিনসেন্ট, আর নিজেকে, যিনি এই কাহিনি লিখছেন। আমরা জানি, 'পার্শিয়াল ম্যাজিক ইন দ্য কুইকসোট' প্রবন্ধে হোর্হে লুইস বোর্হেস ডন কুইকসোটের একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দেখান যে কুইকসোট নিজেই কুইকসোটের কাহিনি পাঠ করছে। *হ্যামলেট*-এ হ্যামলেট একটা নাটক দেখে, যেটা ঠিক তার নিজের জীবনের কাহিনিরই মতো। রামায়ণের শেষের দিকে রাম রামকথা শোনে লব ও কুশের মুখে, আর রামায়ণকার বাল্মীকি নিজেই সেই কাহিনিতে চলে আসেন লব ও কুশের গুরু হিসেবে। রাম রামকথা লেখার জন্য গুরুদক্ষিণা দেন বাল্মীকিকে। আরব্য রজনীতে শাহেরজাদি সুলতানকে রোজ নতুন কাহিনি শোনায়, ৬০২ নম্বর রাতে সে শোনায় সুলতানকে সুলতানেরই জীবনকাহিনি। বোর্হেস বলেন, এভাবে গল্পের চরিত্র যখন নিজেই গল্পের শ্রোতা হয়ে যায়, তখন পাঠকেরা হয়ে যায় কল্পিত চরিত্র। (*সাহিত্য প্রতিচ্ছায়া* বইয়ে শেখর বসুর কাছ থেকে জেনেছি।)

নিঃসঙ্গতার এক শ বছর বইয়ে গার্সিয়া মার্কেস এই ম্যাজিক করেছেন। অরেলিয়ানো নামের এক তরুণ মেলাকুয়েদেস নামের রহস্যময় জিপসির পার্চমেন্টে পড়ে ফেলে সেই কাহিনি, যা বহু আগে রচিত, যা আসলে তাদের বংশে ঘটে যাওয়া এত দিনকার ঘটনা, অর্থাৎ গল্পের চরিত্র নিজেই গল্প পড়তে থাকে।

পারা যায়। কিন্তু অনিবার্যভাবে আলো এসে রাতটাকে গলিয়ে ফেলবে।

কোনো আগামীকাল নেই।

কোনো শ্রোতা নেই।

আমি মিনতি করি। বন্ধু। সুখী হও। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা হচ্ছে, তোমার সুখী হওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের একমাত্র আশা।

কুয়াশার মধ্যে ঘোড়ার গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি গাড়ি স্টার্ট দিই।

এখানে আমরা দেখছি, যিনি গল্প বানাচ্ছেন তিনি নিজেই গল্পের চরিত্র। তিনি যাদের কথা ভাবছেন, তাদের সঙ্গে আবার তার দেখাও হয়ে গেল।

যাক। উপন্যাস শেষ। একটা ফালাসি বলে শেষ করি। কুন্ডেরা *স্লোনেস* বইয়ে ধীরতার প্রশংসা করেছেন। গতির নিন্দা করেছেন। এই উপন্যাসের যাঁরা প্রশংসা করেছেন, তাঁদের কাছে প্রশংসনীয় দিক হলো এর দ্রুততা। *স্লোনেস* সম্পর্কে *ইনডিপেনডেন্ট* (সানডে) লিখেছে, 'দ্রুত, সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সেক্সি, বিনোদনদায়ী।' *টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট* লিখেছে, 'কুন্ডেরার এই দ্রুততম উপন্যাসে একটাও ঢিলে অনুচ্ছেদ পাওয়া যাবে না।'

হা, খোদা, তিনি লিখতে চাইলেন ধীরতার প্রশংসা, আর লিখলেন দ্রুতগামী একটা উপন্যাসিকা!

ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার রিভিউ দিয়ে শেষ করি : '*স্লোনেস* একবার ফিকশন একবার ফ্যান্টাসি, একবার স্মৃতিকথা, একবার প্রবন্ধ, পারদের মতো এত আকার পরিবর্তনকারী, এতটা নির্লিপ্ত যে এটা কখনোই ভূমি স্পর্শ করে না।' শেষেরটা প্রশংসা না নিন্দা বুঝলাম না। তাহলে ফেবার অ্যান্ড ফেবার তাদের বইয়ের শেষ মলাটে এই রিভিউয়ের এই কটা লাইন উদ্ধৃত করলই-বা কেন?

সানডে টাইমস-এর মতে, কুন্ডেরা হলেন জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ!

ধন্যবাদ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org